Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মিজানুর রহমান খান
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.10
Pages	181-227
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহ্‌সান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ

মিজানুর রহমান খান

জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিল্পের সৃষ্টি। বস্তুজগদ্‌দৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রকাশে এবং প্রয়োজন-চেতনায় একদিন যেমন মানুষ তার ভাষাকে নির্মাণ করেছিলো, ঠিক তেমনি মানুষ তার বস্তু-অভিজ্ঞতাশাসিত অনুভূতি এবং সংবেদনার নান্দনিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলো শিল্প বিনির্মাণের ইতিহাস।

শিল্পকৃতি কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়; মানবসমাজে অবস্থান ক'রেই একজনের ব্যক্তি-অনুভূতি ও সংবেদনার ব্যাপারটি যখন অপরাপর ব্যক্তি-মানুষের চেতনায় বিলোড়ন জাগাতে পারে, এমন কি অপরাপর ব্যক্তি-মানুষের আবেগ অনুভূতি ও সংবেদনাকে সচল করতে পারে, তখনই তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন এবং দাবি করে শিল্পের মর্যাদা। মানুষের বিশ্বাত্মবোধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতই অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সংবেদনার সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং শিল্প অনিবার্যভাবেই বিশ্বাত্মবোধের একটি পরিমার্জিত পরিশীলিত পরমসূক্ষ্ম সংস্করণ। কারণ পরিবেশ-অন্তর্গত অভিজ্ঞতা, কর্মচাঞ্চল্য, জীবিকার উপায়, বিশ্বাস ও আচরণকে মানুষ তার মহৎ জীবন থেকে পৃথক ক'রে দেখতে পারে না। শিল্প তাই জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট মানুষের পরমসূক্ষ্ম বিশ্বাত্মবোধেরই নামান্তর, যেখানে চেতনার সংস্পর্শে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এক বিচিত্রবর্ণিল অনিবার্যরূপ লাভ করে।

মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তির এক স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই কাব্যশিল্পের নির্মাণ-প্রসঙ্গ পৃথিবীতে বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু ভাষা আবিষ্কারের কাল পর্যন্ত কবিতার অস্তিত্ব মানবসমাজে ছিলো না। অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার ভাষা আবিষ্কার করে, সেদিন থেকেই মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তার চেতনা-পরিস্রুত চিন্তা-জগৎকে কাব্যসৃষ্টির এক বিশুদ্ধ প্রকল্পে নিয়োজিত করে। মানব-অস্তিত্বের মর্মমূলে

যে বস্তুধর্ম, সেই বস্তুধর্মের আলোকেই কবিতার প্রাণ-প্রাচুর্য সতঃউদ্ভাসিত। কাব্য-সৃষ্টির অনিবার্যতা প্রকৃত অর্থেই বৈশ্বিক ব্যাপার। 'কবিতা কবির ব্যক্তিচিত্তে বিধৃত জীবনচেতনার সামাজিক স্বীকৃতি-নির্ভর ভাষাশিল্পসঙ্গত সচেতন অভিব্যক্তি। তার জীবনচেতনা অবশ্যই সমকালের দ্বন্দ্বমুখর ও বিবর্তনচঞ্চল জীবনপ্রবাহ থেকে অর্জিত, এবং কবিতায় তা সমকালের পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।'[১] মানবীয় অস্তিত্বের অনুকূলে ব্যক্তির যে কালচেতনা, আকাঙক্ষা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, তা কবিতায় অভিব্যঞ্জিত হয় সহজেই — সুতরাং কবিতার সদর্থকতা জীবন ও জগতের সুবিশাল অথচ সূক্ষ্ম রহস্যের অনুকূলেই কেবল নির্ণীত হতে পারে। 'কবিতার সদর্থকতা' এখানে জীবনবোধের ইতিবাচকতাকেই চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সময় ও সমাজের অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া বিক্রিয়ার পটপরিসরে (Backgroun) কবিতার বক্তব্য-ব্যঞ্জনায়, রূপ ও আঙ্গিকে ভিন্নতর প্রণোদনা পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জগতের দ্বন্দ্বমুখর বাস্তব পরিস্থিতি কবির মানস-সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তখন নিয়তির মতো নিয়ন্ত্রিত হয় কবিতাও। কবিতার বাহন যে ভাষা, সে ভাষাও তখন কালধর্ম তথা সমাজধর্মকে আত্মস্থ করেই পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব একটা রূপ ও রীতি বর্তমান। কিন্তু ভাষা সময়ের ব্যবধানে কিংবা যুগধর্মের কারণে অর্থ বহন করতে চায় নতুনভাবে। ভাষার সেই নৈমিত্তিকতায় কবিতার প্রাণস্পন্দন অনেক বেশি সচল ও সংহত হয়। মানুষের যে প্রাণজ অভীপ্সা ও চিন্তাতরঙ্গ কাব্যরূপ লাভ ক'রে পৃথিবীর আলোকসভায় দাঁড়াতে চায়, তার জন্যে প্রয়োজন কৃত্রিম গাত্রাবরণের। কবিতার দেহসজ্জার ব্যাপারটি হয়ে ওঠে দুরপনেয়। কবিতার সেই আবরণ কিংবা দেহসজ্জার ব্যাপারটি কালক্রমে অর্জন করেছে চমৎকার এক পরিভাষা। কাব্যবোদ্ধা অথবা কাব্যপ্রেমিক মাত্রেই তাকে অলঙ্কার বলেই জানেন। আরো ব্যাপক অর্থে তা হলো নন্দনতত্ত্ব একজন কবি যে-চেতনায় অথবা সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার কারণে কাব্যশরীরকে সালঙ্কার ক'রে তুলতে চান —তাঁর সেই চিত্ত তথা মননও সূক্ষ্ম বিচারে অলঙ্কারময়। নইলে সৃষ্টি তাঁর অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য। প্রথমত, সহজাত কারণেই মানুষের চিত্ত তথা অন্তর্জগৎ শিল্পিত, একে ঠিক অর্জন করা যায় না। তবে সহজাত শিল্পিত সেই অন্তর্জগৎ তখনই প্রকাশের যন্ত্রণা অনুভব করে যখন বস্তুময় পৃথিবীদৃষ্টে অভিজ্ঞতার জগৎ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়, চেতনা হয় শাণিত, পৃথিবী যখন ইঙ্গিত করে অন্তর্জগতে পৃথক কোনো বলয় বিনির্মাণের জন্যে। দ্বিতীয়ত, ঠিক একই কারণে মানুষ শুধু তার ভাষা নির্মাণই করেনি, সভ্যতার আদি থেকেই মানুষ তার 'মুখের ভাষাকেও সুন্দর ক'রে প্রকাশ করবার দুর্নিবার তাগিদ অনুভব করেছে।' তৃতীয়ত, ভাষার শিল্পিত, পরিমার্জিত, সংহত এবং সুশৃঙ্খল কোনো রূপ-নির্মিতি যখন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, মানুষ তার শাণিত চেতনার ঔজ্জ্বল্যে আপন সৃষ্টির জগৎ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছে ঠিক

তখন থেকেই। কালপরিক্রমায় মানুষ কাব্যশিল্পকে অঙ্গীকার করেছে জীবনের মহত্তর রূপকল্পে।

।। এক ।।

পূর্বসূরিদেরকে কিংবা অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে নয়, বরং আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারাবাহিকতায় দূর ও নিকট ঐতিহ্যকে স্মরণ ক'রেই আহসান হাবীবের কাব্য-প্রয়াস সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছে। কিন্তু তাঁর কবিদৃষ্টি পশ্চাদ্‌গামী নয়। বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ভয়াবহ আন্তর্জাতিক ঘটনা হলো ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বস্তুত এই যুদ্ধই দ্রুত তরান্বিত করেছে সমগ্র বিশ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সমূহকে। ফরাসী বিপ্লবোত্তরকালে পশ্চিমের সমাজে ও রাষ্ট্রে যে-পরিবর্তন ঘটেছিলা, সেই পরিবর্তন পশ্চিমের শিল্পসাহিত্যকেও করেছিলো স্পর্শ। কালধর্মের স্বাভাবিকতায় বাংলা সাহিত্যও সেই প্রভাব এড়াতে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনদর্শনের যে-কল্যাণচেতনা জাতিকে আশান্বিত করেছিলো, তাকে লালন করেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সংস্কৃতির যৌথ আবেদনকে স্বীকার করেছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্টির সেই কল্যাণময়ী আদর্শ আর বিশ্ব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে অস্বীকার ক'রে তিরিশের কোনো কোনো কবি জীবনে ও সাহিত্যে আবিষ্কার করতে থাকলেন কৃত্রিম অবক্ষয়দীর্ণ দুষ্টক্ষত। তিরিশের কবিদের সেই স্রষ্টামনন স্বাভাবিক বা হয়ে-ওঠা নয়। প্রতিভার গগনস্পর্শী গুণেই তিরিশের সেইসব কবি জীবনের নেতিবাচকতাকে শিল্পের উপজীব্য করেছিলেন তাঁদের সৃষ্টিতে। কিন্তু আহসান হাবীব আরোপিত জীবনবীক্ষাকে অস্বীকার করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। বরঞ্চ যে-সমাজ ও সময়ে তাঁর বসবাস, সেই সমাজ ও সময়কে আত্মস্থ করেই জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসকে আপন কবিশক্তিতে জারিত করেছেন তিনি। তিরিশের কাব্যধারার অতি নিকটবর্তী হয়েও তাঁর কাব্যভাবনা আপন বলয়-নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রান্তও স্বতন্ত্র সূত্রে প্রদীপ্ত। তিনি, উত্তরাধিকারের 'সীমা না ভেঙেই কাব্য-ভাবনার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেছেন—সমাজ নির্ভরতা থেকে ঐতিহ্য ইতিহাস ও শাশ্বত মূল্যবোধ নির্ভরতার মধ্যে।'[২]

প্রকাশভঙ্গি অথবা নির্মাণ-কৌশলের প্রশ্নে আহসান হাবীবকে তিরিশের কবিকুল থেকে পৃথক ক'রে দেখা যায় না। যেহেতু পশ্চাদ্‌গামিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, সেহেতু রবীন্দ্রসৃষ্টির বিস্তৃত বলয়ে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। তাই সমাজ ও সময়বিবিক্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আহসান হাবীব অনুসরণ করেছেন তিরিশের কাব্যনির্মাণ কৌশলকে। কবিতার ভাব ও ভাষা প্রয়োগ, শব্দ-

নির্বাচন এবং কখনো কখনো চরণবিন্যাসেও আহসান হাবীব তিরিশের কাব্যঐতিহ্য-অনুসারী। কিন্তু বিষয়বস্তু তথা জীবনদর্শন নির্মাণে আহসান হাবীব তিরিশের কবিদের পাশাপাশি চল্লিশের নব-উদ্ভূত জীবনমুখী কাব্যধারাকে অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং তিরিশের কাব্যান্দোলনের পৃথক দু'টি ধারাকে সাঙ্গীকৃত করেই আহসান হাবীবের সৃষ্টিজগৎ সম্প্রসারিত। বক্তব্য এবং প্রকাশরীতি এই পৃথক দু'টি প্রসঙ্গ পৃথক দু'টি ধারার অনুবর্তী। তথাপি আহসান হাবীবের সৃষ্টিসম্ভারে ছিলো স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য, যা তাঁরই নিজস্বতায় উজ্জ্বল।

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব-উদ্বুদ্ধ হয়ে,নয় বরং আবেগ ও অনুভূতির প্রাখর্যে জীবনমুখী চিন্তা প্রকাশে আহসান হাবীব উৎসাহী ছিলেন পূর্বাপর। মানব জীবনের বিশাল সাম্রাজ্যে জন্ম-মৃত্যু-জরা-হতাশা-আশা-আকাঙক্ষার যে নিত্য বহমানতা, সে-সবেরই সারাৎসার কবির চিত্তে আন্দোলিত হয়েছে অধিক। আর জীবনসম্পর্কিত এইসব মৌলিক জিজ্ঞাসাই বস্তুত আহসান হাবীবের কাব্যকে দান করেছে বিশিষ্ট চারিত্র। নিভৃতচারিতার যে-অভিধায় আহসান হাবীবের কবি-প্রতিভা অধিক পরিচিত তার তাৎপর্য নির্ণীত হতে পারে কবির জীবন ও জগৎকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রবণতাকে চিহ্নিত করবার মধ্য দিয়ে। সময় এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদি আহসান হাবীবের সৃষ্টিকর্মের সীমারেখা টানা যায়, তবে সহজেই দৃষ্ট হবে যে, একটা ব্যাপক তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কবির উত্থান, বিকাশ ও পরিণতি। অথচ সেই চাঞ্চল্য-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি কবিকে বিচলিত করেনি। আর তার সহজ অর্থ এই নয় যে, কবি রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন। রাজনীতির প্রজ্জ্বলন্ত মশাল হয়তো তাঁর হাতে ছিলোনা, কিংবা শ্লোগান ছিলো না তাঁর কণ্ঠে। কিন্তু প্রজ্জ্বলন্ত মশালের আলোক-সম্ভারের মতোই তাঁর কবিতা অত্যুজ্জ্বল এবং শ্লোগানে শ্লোগানে ধ্বনিত হয় জীবনের যে-স্বপ্ন ও চাহিদার কথা, তারও দ্যুতিময় প্রকাশ আহসান হাবীবের কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত জীবনের অনতিক্রমণীয় হতাশা আর উদ্বেগাকুল পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠা তাঁর কবিত্বশক্তি সবকিছুকে সমান্তরালভাবে নিরীক্ষণ করেছিলো। আর সেই কারণেই তাঁর কাব্যপ্রয়াস জীবনের অন্তর্গূঢ় ইতিবাচকতায় ভাস্বর এবং প্রকাশরীতির প্রশ্নে তা যথার্থই নিটোল। অনুভূত এবং স্থিত ভাব প্রকাশের আকাঙক্ষার সঙ্গে শব্দচয়ন, ভাষাব্যবহার, উপমানির্বাচন, চিত্রকল্পসৃষ্টি, প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাকার অনুষঙ্গ বহুলাংশেই সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সমকালীন অন্যান্য কবির মতো আহসান হাবীবও ক্রসমাজ কাল জীবনকে তুলনামূলকভাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নিত করায় সচেষ্ট হলেন.....কাব্যভাবনায়, চিত্রকল্পে, রূপকে উপমায় আর স্বাতন্ত্র্যকামী কণ্ঠস্বরে।'[৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সভ্যতাকে বিদ্রূপ ক'রে এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে

বিপুলভাবে, শিল্পী-সাহিত্যিককে তো বটেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র দু'বছরের মধ্যেই আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭) প্রকাশিত হয়। বিশ্ব-রাজনীতির এক সংরক্ত সময়ের পটভূমিকায় *রাত্রিশেষ* কাব্য দিয়েই কবির যাত্রা শুরু। যে-সময়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন সেই সময়টা ছিলো অস্থির; কবির ভাষায়ও 'বন্ধ্যা,' এমনকি সেই সময়ের পথটাও ছিলো দুর্গম তথা রক্তাক্ত। তাই তাঁর সৃষ্টিকর্মের শুরুটাই ছিলো নেতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ:

দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।
আকাশে আজিও কামনার শিখা উজ্জ্বল কমনীয়।
জ্বলে দিগন্তে দীপ্ত দিবার দীপগুলি রমণীয়।
আমার নয়নে নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার
অন্ধকারের গুহাতে ব্যর্থ বাহুবিথার।
['দিনগুলি মোর': *রাত্রিশেষ*]

এই উচ্চারণের স্বাভাবিকত্ব নির্ণীত হতে পারে তিরিশের কবিদের নেতিবাচক বিশ্বাসের পটভূমিকায়। কিন্তু এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, কবি তাঁর সময়কেই ধারণ করেছেন কবিতায়। সময় ও সমাজ-সচেতনতার কারণে-তাঁর কবিতার বক্তব্য যেমন স্পষ্টতায় উজ্জ্বল, তেমনি প্রকাশরীতিও স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। *রাত্রিশেষ* কাব্যের প্রথম কবিতার শুরুতেই যে-উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা কবির সময়ধর্মকেই চিহ্নিত করেছে বহুলাংশে। তাঁর সমকাল—''বিকলপক্ষ পাখির মতো বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান'—'এখানে আছে যন্ত্রণাকাতর কবিচিত্তের প্রতিফলন, আছে সুতীব্র চিৎকার। এবং উপমায় সজ্জিত প্রতিটি শব্দ ক্রম-পরম্পরায় ঘন-পিনদ্ধ। পুরো কবিতা জুড়েই এ-জাতীয় শব্দের উপস্থিতি—'নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার', 'অন্ধকারের গুহাতে ব্যর্থ বাহুবিথার', 'লক্ষ বীজাণু কুটিল মৃত্যুদূত', 'নীল অরণ্যে এল অপঘাত', 'যুগের চিতায় জ্বলে', 'অন্ধ নয়নে', 'হ্রস্ব চরণ বঞ্চনা-বিক্ষত', 'জরতী রাতের দুঃস্বপন', 'চির দহনের তিক্ত শপথ', 'শর খাওয়া এক হরিণশিশুর আর্তনাদ,' এবং এই আর্তনাদের মধ্য দিয়েই কবিতার সমাপ্তি।

রাত্রিশেষ কাব্যের পর্ববিভাগটি লক্ষযোগ্য। আমরা জানি কবি-প্রতিভা ক্রমপরিবর্তনশীল। কিন্তু সেই রূপান্তর হবে না কোনো প্রকল্প-নির্ধারিত। অথচ আহসান হাবীব তাঁর ক্রম-সংহত চেতনাস্পর্শী উচ্চারণকে চারটি পর্বে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক নামকরণও করেছেন পর্বসমূহের। প্রথম পর্বের নাম 'প্রহর।' 'প্রহর'র কবিতা-সংখ্যা এগারো। এগারোটি কবিতায় নানাভাবে এসেছে জীবনের ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, আতঙ্ক, হতাশা; এসেছে বন্ধ্যাত্ব, বৈরিতা ও স্থবিরতা এবং ক্ষুধা, জ্বরা ও মৃত্যুর পাশাপাশি কর্মহীন, উৎপাদনহীন, সৃষ্টিহীন বিপ্রতীপ সময়ের কথা।

'প্রহর' পর্যায়ে হতাশার যে-উচ্চারণ, তা থেকে কবিচিন্তার উত্তরণ ঘটেছে 'প্রান্তিক' পর্যায়ে সমাজমনস্কতায়, রাজনৈতিক সচেতনতায় আর ইতিহাসবোধের

যৌক্তিক পরিণতিতে। হতাশার মধ্যে থেকে আশাবাদের যে-উদ্বোধন, সেখানেই জীবনের মূল্যায়ন হতে পারে নতুনভাবে। পরাধীন জাতির অবক্ষয়গ্রস্ত বন্দিদশার নিরসনে জাতির জেগে উঠবার প্রয়োজনীয়তাকে কবি সমর্থন করেন, এমনকি আবেগের তীব্রতায় তিনি উচ্চারণ করেন:

দ্বারপ্রান্তে বন্দী আমি দুই শতকের,
আমার আত্মার তলে অগ্নিশিখা সাতান্ন সনের
আজো অনির্বাণ,
তবু কি পাহারা দেবে হাসিমুখে আমার জিন্দান?
['*সেতু-শতক*' : *রাত্রিশেষ*]

এই ইতিহাসবোধ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি এক ধরনের আশাবাদেরও প্রকাশ ঘটেছে আহসান হাবীবের কবিতায়।

পাঁচটি কবিতা নিয়ে 'প্রতিভাস' পর্বটি রচিত। নিস্তরঙ্গ জীবন আর নস্টালজিয়া-তাড়িত অতীতকে নিয়েই এ-পর্বের কবিতাগুলো ভাস্বর। এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ।' এ-কবিতায় কবি গ্রামীণ জীবন-পরিবেশের স্মৃতিময়তায় অন্তর্লীন হতে চেয়েছেন।

'প্রহর' পর্বে কবির হতাশাগ্রস্ত চিত্তের পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু কাব্যের মধ্যভাগের 'প্রান্তিক' ও 'প্রতিভাস' পর্ব বেয়েই 'পদক্ষেপ' পর্বে এসে কবি আলোকিত বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছেন। বিশ্বময় নিঃশেষিত 'অহিংসারগৌরব' পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারে কবিকণ্ঠে জেগেছে বিদ্রোহের বাণী। 'হায়নার নয়ন' আর অশুভ শক্তির 'লেলিহ তীর্যক ফণা'কে চিরতরে স্তব্ধ করবার জন্যে উচ্চারিত হয়েছে:

অতএব হে বাঁশরী
অসি হও অসি হও তুমি!
সুরের পেলব কুঁড়ি পেছনে উড়াও;
এবার দিনের চূড়া আকাশে ঘুরাও।
অরণ্য স্বপন নয়
এবার আরণ্য প্রতিরোধ।
['*হে বাঁশরী অসি হও*' : *রাত্রিশেষ*]

প্রতিরোধের তেজোদ্দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে নিভৃতচারী কবি এবার রাজপথে নেমেছেন জনতার কাঁধে কাঁধ মেলাতে:

এবার এলাম
হাজার জনতা যেথা নিত্য দেয় দাম
পীতরক্তে জীবনের, সেই রাজপথে।
['*স্বাক্ষর*' : *রাত্রিশেষ*]

শোষিত, বঞ্চিত, দারিদ্র্যপীড়িত বিশাল মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে আমৃত্যু হাত মেলাতে চান কবি। এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের অবিনশ্বরতা বিনির্মাণের প্রশ্নে সংগ্রামরত

মানুষের নিত্য চলার সঙ্গী হতেও চান তিনি। আশা–নিরাশার দোলাচলে দ্রবীভূত হতে হতেই *রাত্রিশেষ* কাব্যের সমাপ্তিতে আহসান হাবীব ইতিবাচক জীবন–জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। চেতনার ক্রম–বিবর্তনে কবির আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড রোডের প্রান্তে
কেন না
এ দিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য।
['রেড রোডে রাত্রিশেষ': *রাত্রিশেষ*]

প্রবল নেতিচিত্রের মধ্য দিয়ে *রাত্রিশেষ* কাব্যের শুরু, আর শেষ তার আশাবাদের সুতীব্র উচ্চারণে। পুরো ব্যাপারটিই সংঘটিত হয়েছে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতো। 'নৈরাশ্য–অতিক্রমী আশার সুর'[৪] শুনিয়ে আহসান হাবীব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে ইতিবাচক জীবন–জিজ্ঞাসাকেই অঙ্গীকার করেছেন।

কবিতা যেহেতু একটি জটিল শিল্পমাধ্যম সেহেতু তার নির্মিতিও অনায়াসাধ্য নয়। কবির অন্তর্জাগতিক অনুভূতি কিংবা সংবেদনার গভীরতা পাঠকের চিত্তে জাগিয়ে তুলবার জন্যেই উপযুক্ত শব্দব্যবহার, উপমা নির্বাচন অথবা চিত্রকল্পসৃষ্টি কবিতার ক্ষেত্রে জরুরি ব্যাপার। 'আহসান হাবীব বৈপরীত্য সজাগ কবি, এই বৈপরীত্য–বোধ সর্বদাই রূপক ও ইঙ্গিতময়তার সাহায্যে সমন্বিত হয়েছে।'[৫] পরিপার্শ্ব এবং অবস্থান–প্রসঙ্গ প্রকাশের জন্যে কবি ব্যবহার করেছেন কতকগুলো সরল উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা। সংখ্যায় তাও নিতান্তই স্বল্প।

উপমা

১. দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।
['দিনগুলি মোর': *রাত্রিশেষ*]

২. কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দু'টি সাপের মতন,
কাশ্মিরী মেয়েটির দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো:
['কাশ্মিরী মেয়েটি': *রাত্রিশেষ*]

৩. বিনয়ী মেষের মত সন্ধ্যাবেলা একে একে
সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।
['সৈনিক': *রাত্রিশেষ*]

৪. সেইসব স্বপ্ন
যারা আকাশের নীলের মতন।
['প্রদক্ষিণ: রাত্রিশেষ]

৫. এখানে এই বিশাল পথ জড়িয়ে
অন্ধকার পড়ে আছে
দীর্ঘকায় সাপের মত।
['রেড রোডে রাত্রিশেষ': *রাত্রিশেষ*]

উৎপ্রেক্ষা

১. আকাশে সেদিন ছিল মেঘহীন, পৃথিবীর পথ চেয়ে
প্রথম প্রেমের পরিচয় ছিল যেন সে কুমারী মেয়ে
['এই মন এই মৃত্তিকা': *রাত্রিশেষ*]

২. এ মানুষ চলে যেন মৃতের মিছিল
সাড়া নেই কোনো।
সবার সমুখে
অলক্ষ্য উদ্ধত মুঠি জেগে আছে যেন।
['একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ' : *রাত্রিশেষ*]

রাত্রিশেষ কাব্যের সর্বশেষ কবিতার শুরুতেই একটি অসাধারণ চিত্রকল্প পাঠকের বোধকে সচকিত ক'রে তোলে। 'রেড রোডে রাত্রি শেষ' হতে চলেছেএই বক্তব্যের ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পটিতে:

রাতের পাহাড় থেকে
খসে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধসে ধসে পড়ছে।
দু'হাতে সরিয়ে তাকে নির্বিকার নিরুত্তাপ মন
এগোলো।

আমরা জানি একটি চিত্রকল্প আলঙ্কারিক সমগ্রতাকে ধারণ করেই নির্মিত হয়। ওপরের চিত্রকল্পটিতে বিদ্যমান চিত্রগুলোর পাশাপাশি অন্য অলঙ্কারও সমাসীন। আমরা এও জানি যে, অন্ধকারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাত্রির একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'রাতের পাহাড়' থেকে 'অন্ধকার ধসে' পড়বার কল্পনা অভিনব, বিশেষত তা যখন পাথরের মতো খসে খসে পড়ে। 'রাতের পাহাড়' এখানে রাত্রির গভীরতাকেই নির্দেশ করেছে, যে-রাত্রির গভীরতা বিদূরিত না হয়ে বরং 'ধসে ধসে পড়ছে।' এবং ধসে পড়া অন্ধকারের 'স্তূপ' আমাদের অভিজ্ঞতায় কাজ করে অনায়াসে। স্তূপীকৃত সেইসব গভীর অন্ধকার 'দু হাতে সরিয়ে' নির্বিকারচিত্তে কবি যখন এগোলেন, তখন আর তার সামনে জীবন বিপন্নকারী সীমাহীন বাধার প্রাচীর নেই। কারণ, তখন 'রেড রোডে রাত্রিশেষ।' প্রত্যাশিত জীবনের দ্বারপ্রান্তে তখন নতুন দিনের নতুন সূর্যের অপূর্ব ইঙ্গিত।

।। দুই ।

আলোক-উদ্ভাসিত পৃথিবীর যে-ইঙ্গিত *রাত্রিশেষ* কাব্যের পরিসমাপ্তিতে পাওয়া গেছে, তারই অনুরণন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে *ছায়া হরিণ* (১৯৬২) কাব্যে। সমাজ ও সংসারজীবনের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-জীর্ণ দীর্ঘ সময়ে আহত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিই হলো আহ্‌সান হাবীবের *ছায়া হরিণ* কাব্য। দ্বিতীয় মহাসমর ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় আহসান হাবীবের এ-কাব্যটি প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশের পনেরো বছর পর। অথচ হতাশা বা বিকৃতির অশুভ কোনো ইঙ্গিত এ-কাব্যকে স্পর্শ করতে পারে নি। বরঞ্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক লোকক্ষয় ও রক্তাক্ত পরিস্থিতি এবং মন্বন্তরের দুঃসহ পটভূমিকায় কবি আরো বেশি প্রকৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসংলগ্ন হয়েছেন। রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশাল পরিক্রমায় প্রকৃতির

ব্যবহার তাৎপর্যময় এবং ঋদ্ধ। আবার এও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ছিলো স্মৃতির প্রকৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে, তিরিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি ছিলো প্রত্যক্ষ দৃষ্টিসঞ্জাত। জীবনানন্দ দাশের সমকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভয়াল পরিস্থিতি এবং তিরিশের নেতিবাদী জীবনজিজ্ঞাসার বিপরীতে তিনি প্রকৃতির সীমাহীন শান্তক্রোড়ে আশ্রয় খুঁজেছেন। অনুরূপ আহসান হাবীবও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংরক্ত সময়ের পটভূমিকায় প্রকৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে লীন হতে চেয়েছেন আশাবাদের অবিচল আস্থায়। সুতীব্র আশাবাদের সূত্রে কবির দেশেপ্রেমের গভীরতা উজ্জ্বল হয়ে আছে এখানে:

মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।

বাংলার আকাশ-অরণ্য, বৃক্ষ-সমুদ্র, সুর-সঙ্গীত ইত্যাকার বস্তুকে ভালোবেসে ধন্য হয়েছেন এ-বাংলারই অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক যুগে যুগে কালে কালে। কিন্তু দেশ-মাতৃকার প্রতি কবির ভালোবাসার চিহ্ন যখন সেই দেশেরই 'আকাশে' 'অরণ্যে' আর 'সমুদ্রের ঢেউয়ে', লেখা থাকে, তখন কবির সেই ভালোবাসার গভীরতাটা উপলব্ধি করবার জন্যে তাগিদ জাগে রীতিমতো। সন্দেহ নেই, নিরাভরণ এই চরণ বিন্যাসে আহসান হাবীবের কবিসত্তা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে গভীর মমতায়।

রাত্রিশেষ কাব্য থেকে যে-অঙ্গীকারের প্রশ্নে কবিচিন্তার উত্তরণ ঘটেছে *ছায়া হরিণ* কাব্যে — অর্থাৎ আশাবাদের যে অঙ্গীকার, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কাব্যের অন্তত আটটি কবিতায়। কবিতাগুলো হচ্ছে — 'তোমাতে অমর আমি', 'সমুদ্র অনেক বড়', 'জীবন', 'ইতিহাস বিন্যাসের পথে', 'পুনর্বাসন', 'মুহূর্ত', 'শুক্ল-পক্ষের গান' এবং 'ফুটবে ফুল।', বস্তুত বিশ্ব-নাগরিক হওয়ার নিরন্তর আকাঙক্ষার মধ্য দিয়েই কবির আশাবাদের বিস্তৃতি ঘটেছে :

তখন বিশাল এই মানব-মসুদ্রে মিশে
আমিও নির্ভয়ে
অনেক ঢেউয়ের সঙ্গে আরেকটি অনন্য ঢেউ হতে পারি
এবং নির্ভয়ে
আমিও মিলাতে পারি
এই কণ্ঠ পৃথিবীর সঙ্গীতসভায়।
['সমুদ্র অনেক বড়': *ছায়া হরিণ*]

নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির অযুত সম্ভাবনায় আশাবাদের সুর গভীর থেকে গভীরতর হয় কবির জীবনে। এ-কথা সত্য যে, *ছায়া হরিণ* কাব্যে আহসান হাবীব প্রতিভার আন্তরশক্তি উন্মোচনের প্রক্রিয়ায় যত বেশি সাবলীল, ঠিক ততটুকুই তিনি উচ্চারণের স্পষ্টতায় উত্তীর্ণ। নিচের কবিতাংশ লক্ষযোগ্য:

রৌদ্রদগ্ধ দিন আর অরণ্যের ছায়ার প্রসাদ
রাত্রির আকাশ ঘিরে জেগে থাকে চাঁদ;

আশা জাগে ভাষা পাই মনে পাই গভীর আশ্বাস।
লিখি ইতিহাস
আগামী দিনের এক পৃথিবীর প্রাচুর্যের গান।
['জীবন' : *ছায়া হরিণ*]

অথবা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি নিচের কবিতাংশ:

মনে হয়, আমি এই পৃথিবীর এক
সহিষ্ণু সন্তান
যার
আশৈশব পিপাসার প্রতিমার এই অবক্ষয়,
এই নিত্য শেষ হওয়া, মুছে যাওয়া এই অপমান
একদা সার্থক হবে পৃথিবীতে।
['শুক্লপক্ষের গান' : *ছাঁয়া হরিণ*]

'আশাবাদের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা'[৬] *ছায়া হরিণ* কাব্যের তাৎপর্য বাড়িয়েছে অবিসংবাদিতরূপে। এ-কাব্য স্বদেশপ্রেম এবং ইতিহাস-বোধাশ্রয়ী কবিতার সংখ্যা ছয় থেকে সাতটি। অন্যসব কবিতা কবির সাধারণ বোধের অন্তর্গত। দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলোর মধ্যে কবির নস্টাল-জিয়াক্রান্ত গ্রামীণ জীবন-অন্তর্গত পরিবেশের পরিচয় বেশ স্পষ্ট। অন্যদিকে আবার ইতিহাস-বোধাশ্রিত কবিতাগুলোর সঙ্গে বিশ্ববোধের ব্যাপারটিও সম্পৃক্ত।

চেতনা-বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় *ছায়া হরিণ* কাব্যে আহসান হাবীব যত বেশি বিষয় তথা বক্তব্য সচেতন, তত বেশি ছন্দ-অলঙ্কারের সমাবেশ কিংবা কারুকাজ তাঁর এ-কাব্যে নেই ছন্দ-অলঙ্কারের আতিশয্য এ-কাব্যে নেই। অথচ বক্তব্য-বিষয় স্পষ্ট এবং ঋজু। পুরো কাব্য জুড়ে পাঁচ থেকে ছ'টি মাত্র উপমার সাক্ষাৎ মেলে। এমনকি একটিমাত্র কবিতা ব্যতীত কোনো কবিতাতেই একাধিক উপমা আবিষ্কার করা যায় না। উপমাগুলো নিম্নরূপ:

১. এই দেশ দেশের মানুষ
মানুষের সুখ দুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছ মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মতো।
['তোমাতে অমর আমি' : *ছায়া হরিণ*]

২. প্রথম কান্নার মত ঝরে পড়া কুয়াশার জাল
সেই স্বপ্ন-সম্ভারের অপরূপ শীতের সকাল।
['শীতের সকাল' : *ছায়া হরিণ*]

৩. মৃত্যুর মতন তার সারা দেহ শীতল
['চরিতাখ্যান নববর্ষ' : *ছায়া হরিণ*]

৪. কেননা তখন
পাখিদের মনে হয় আশ্রিত অথবা
কখনো বা নিমন্ত্রিত অতিথির মত।
['ঈর্ষার আলোকে আমি' : *ছায়া হরিণ*]

৫. তুমিও অমন
সর্বদা সমস্ত মুখ ভার ক'রে মারখাওয়া
পশুর মতন
বোবা দৃষ্টি মেলে রেখে
স'রে স'রে থেকোনা কখনো।
['দ্বৈত' : *ছায়া হরিণ*]

৬. যে কালে হৃদয় ছিল
নদীর স্রোতের মত
ইচ্ছামতী। পাখির ডানার মত
ছিল তার অসীম নীলিমা;
['অন্যদিন' : *ছায়া হরিণ*]

উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির মতোই অন্যান্য অলঙ্কারের উপস্থিতিও এ-কাব্যে নগণ্য। তবু প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে কবি তাঁর আপন ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচন এবং দেশমাতৃকাকে কবিতায় কিভাবে তুলে এনেছেন তা দেখবার জন্যে দু'টো কবিতার কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. মধ্যরাতে রাজপথে দেখি এক নারীর শরীর
যে নারী নায়িকা ছিলো কোনোকালে এই পৃথিবীর
সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ,
হৃদয়ের রক্ত নিয়ে রেখে গেছে নখরের ছাপ
দেখে মনে হয় বহুভোগ্যা এই নারী,
এ হৃদয় সে হৃদয় নয়।

....
লালসার পাশব লুণ্ঠন
ঘটে গেছে। অতঃপর এই নারী খুলেছে গুণ্ঠন
জনহীন রাজপথে অন্ধকারে ক্লান্ত দুই হাতে।
['ক্রান্তিকাল' : *ছায়া হরিণ*]

২. রাত্রিশেষ!
কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল—
পাতার ঝরোকো খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।
['শীতের সকাল' : *ছায়াহরিণ*]

উল্লিখিত প্রথম কবিতাংশের 'নারী' হচ্ছে কবিরই স্বদেশ — এই বঙ্গজননী। 'নারীর; প্রতীকে স্বদেশের এই পরিচয় দিতে গিয়ে কবি ইতিহাস-বিস্মৃত হননি। অতীতকালের পরাধীন স্বদেশভূমির বিপর্যস্ততার চিত্রই 'নারীর' মধ্য দিয়ে প্রতীকায়িত হয়েছে। আর দ্বিতীয় কবিতাংশের 'ক্লান্ত হরিয়াল' কবি নিজেই। লক্ষ্য করবার বিষয় কবিতাংশের কথাগুলো — 'কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল—।' তারও আগে কবিতাটি শুরু হয়েছে 'রাত্রিশেষ!' শুধু এই সংবাদটুকু দিয়ে। সুতারাং রাত্রিশেষে শীতের সকালে যে-কুয়াশা, যে-অস্পষ্টতায় পারিপার্শ্বিক আবহ হয়ে উঠেছে গুমট ও রুদ্ধশ্বাসময়, সেখানে হরিয়ালের ক্লান্তিবোধ অস্বাভাবিক নয়। সময়টা ছিলো অস্থিরাক্ত জাতীয় কি আন্তর্জাতিক, এই উভয় পর্যায়েই।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' শীর্ষক কবিতাটি পরিচর্যার বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। কবিতা-টিতে অলঙ্কারাদির সমাবেশ নেই। কিন্তু যার জন্যে কবিতাটি বিশিষ্ট, তা

হলো বিন্যাসরীতির পর্যায়ক্রম (Sepuence)। স্মৃতিময় অতীতজীবন, বিশেষত কবির শৈশব-কৈশোরের দেখা গ্রামীণ জীবনের স্মৃতিচিত্র কবিতার প্রতিটি স্তবকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কবিতাটির অংশবিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন:

এখনো কি শেষ বেলা
মুগের ক্ষেতের পাশে পথ ভেঙে
ঘরে ফিরে যেতে যেতে
কালো চোখ তুলে কোনো জেলে-বৌ
প্রশ্ন করে:
এলো নাকি?
আর বলো:
যে গেছে সে গেছে।

কিংবা এই অংশটুকু :

এখনো কি মনে পড়ে সেই নাম
যে নামের মানুষের মন জুড়ে
তুমি নেই
এবং হাটের শেষে ঘরে ফিরে যেতে যেতে
প্রশ্ন নেই :
কত হলো ?
কত এলো ?
এই এক সুর!

প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই কবিতাটি শুধু স্মৃতিচিত্রের বিন্যাস-কুশলতার সূত্রেই বিশিষ্ট নয়, সংলাপধর্মিতা তথা নাটকীয়তার গুণেও তা ভাস্বর। বিশেষত প্রতিটি স্তবক পাঠকালে নাটকের সংলাপ প্রক্ষেপণের আবহ সৃষ্টি হয় চমৎকারভাবে।

॥ তিন ।

ছায়া হরিণ কাব্য প্রকাশের ঠিক দু'বছর পর ১৯৬৪ সালে আহসান হাবীবের *সারা দুপুর* কাব্যটি প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী দু'টি কাব্যে আশা-নিরাশার যে দোলাচল, সময় এবং ইতিহাসবোধদীপ্ত যে-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, *সারা দুপুর* কাব্যে সে-সবের পৌনঃপুনিকতা পরিলক্ষিত হয় না। অধিকন্তু বলা চলে — পূর্ববর্তী কাব্য দুটিতে গ্রামীণ জীবন-পরিবেশের প্রতি কবির যে-ব্যাকুলতা, যে-আকর্ষণ, তা থেকে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন-অন্তর্গত অভিরুচি ও আচরণের প্রেক্ষিতেই কবির মানস-চিন্তার উত্তরণ ঘটেছে এ-কাব্যে। কিন্তু কবি তাঁর সমাজ বা পরিপার্শ্ব এবং সমাজ-পরিপার্শ্ব-অন্তর্গত মানুষকে অস্বীকার করেন নি। কারণ আহসান হাবীবের কাব্যপাঠে মনে হয় না যে তাঁর কাব্য-প্রকর্ষ Arts for Arts Sake-এ পর্যবসিত। জীবন এবং জগতের কথাই তিনি ঘুরে ফিরে বলেছেন তাঁর কবিতায়। তবে জীবন ও জীবনাচরণের প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে সেইসব বিচিত্র-কৌণিক উপলব্ধির প্রকাশ 'ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পথ ধরে' তাঁর কাব্যে ঘটেছে।[৭] এ-প্রসঙ্গে বলা

প্রয়োজন — পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় *সারা দুপুর* কাব্যে আহসান হাবীব প্রকরণগত অনুশীলনে বেশ মনোযোগী। *সারা দুপুর* কাব্যের উপমাগুলো আমরা তুলে আনতে পারি এ-পর্যায়ে :

১. আবরণহীন উলঙ্গ সেই মানবশিশু
আর তার নরম তুলোর মত দেহ
যদি না-ও জেনে থাকে
অবনিশ্বর কবিতার মর্মকথা
['নতুন কবিতা' : *সারা দুপুর*]

২. তাকে দেখি নিজের মনের আর্শিতে —
সকালসন্ধ্যা অনিকেত প্রেয়সীর মত!
['তারা দু'জন' : *সারা দুপুর*]

৩. অন্ধকার হই আর প্রায় অন্ধ দু'টি চোখ তুলে
নির্বোধ পশুর মত চেয়ে থাকি;
['স্বরূপে মহিমা তার' : *সারা দুপুর*]

৪. পণ্যের সম্ভার
তুলে নিয়ে ঘাটে ফেরে
এবং বিশ্রামে
যখন তারার বীথি স্বপ্ন দেয়,
তখন হৃদয়
মনে হয় অবিকল হৃদয়ের মত।
['স্বজন' : *সারা দুপুর*]

৫. এমন সুজন
স্বজন একজন আছে
তার নাম প্রেম—
হৃদয়ে জাগ্রত আছে
অবিকল কৈশোরের মত।
[ঐ : ঐ]

৬. তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার;
['এই ঝড়ে অন্ধকারে' : *সারা দুপুর*]

৭. নরম মসৃণ আর কচি কলাপাতা রঙের এই মুখটি
আহা কত যেন চেনা আমার।
['অভ্যাগত' : *সারা দুপুর*]

৮. সুপ্রাচীন পিপাসার মত
তুমি আছো আমার আজন্ম সঙ্গী হয়ে
['আশা রাখি কেননা' : *সারা দুপুর*]

৯. দেশ থেকে দেশান্তরে গতি তার অব্যাহত
সম্রাটের মত।
[সে আসে' : *সারা দুপুর*]

১০ পৃথিবীর মানবসমাজ
আজ তার শাসনের অনুগত
কিঙ্করের মত
নিত্য তাকে অনুসরণেই
সুখের সন্ধান করে—
[ঐ : ঐ]

১১. আর তোমার ঐ চাঁদকপোলে
একটি কালো তিলের জন্যে
বোখারা আর সমরখন্দ্‌কে
বিলিয়ে দেবার দুঃসাহসও
করব না আর।
['*তোমার জন্যে*' : *সারা দুপুর*]

প্রসঙ্গত *সারা দুপুর* কাব্যের উপমাগুলোর সঙ্গে পূর্ববর্তী কাব্যের উপমাগুলোর তুলনা করা যেতে পারে। এ-কথা সত্য যে, পারিপার্শ্বিক ও অবস্থানগত স্মৃতি এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্তমানের বহির্জাগতিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে জারিত হয় এবং সেই বিজারণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল মানস-সংগঠন এ-ক্ষেত্রে ক্ষুরধার কল্পনা-প্রবৃত্তিও ব্যক্তির সেই মানস-সংগঠন বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একজন কবির মনোলৌকিক চিন্তা ও কল্পনার যে-পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনসূত্রেই তাঁর কল্পলোক-সৃজিত উপমার গঠন ও বৈশিষ্ট্যে আসে বিপুল বৈচিত্র্য। আহসান হাবীবের প্রথম দুটি কাব্যের অধিকাংশ উপমা বৈকল্য, জ্বরা, বিষণ্নতা, শোকগ্রস্ততা, মৃত্যুর বিভীষিকা, নির্যাতিত মানব-অস্তিত্ব ইত্যাদির অনুষঙ্গবাহী। অথচ *সারা দুপুর* কাব্যের উপমাগুলো হতাশাদীর্ণ জীবনচিত্র বহন করে না। এ-কাব্যের উপমাগুলোতে মানবিক প্রশান্তির পাশাপাশি কবির স্বপ্নময় রোম্যান্টিক আবেগ সমুপস্থিত। উপমার পাশাপাশি সমাসোক্তি অলঙ্কারও অপ্রচুর নয় এ-কাব্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১. ঝড়ের থাবারা যদি হানা দেয় মাথার ওপরে
ঘরের পুরনো ছাতে
হয়ত দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন;
['নতুন কবিতা' : *সারা দুপুর*]

২. ঘাটের
'নিবেছে সমস্ত আলো
মরা নদী
নির্জনতা আজ
বিষণ্ন সন্ধ্যায় একা আমি।
['উত্তীর্ণ প্রহরের গান' : *সারা দুপুর*]

৩. তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মতো দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার;
['এই ঝড়ে অন্ধকারে' : *সারা দুপুর*]

৪. সব নিয়ে
তুমি যদি ভেসে যাও, অস্তিত্ব আমার
তবে কোন্ আশ্বাসের মৃত্তিকায় ভর দিয়ে দাঁড়াবে,
[ঐ : ঐ]

৫. দূরে বহু দূরে
রৌদ্রের ফসল ঝরে শুকায়
রাত্রির
শিশিরে নতুন স্বপ্ন জড়িয়ে ঘুমায়।
['মন বলে' : *সারা দুপুর*]

এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, *সারা দুপুর* কাব্যে আহসান হাবীব প্রকরণগত নিরীক্ষায় অধিক উৎসাহী। অথচ সেই প্রাকরণিক নিরীক্ষায় কবিতার বক্তব্য-বিষয় দুর্জ্ঞেয়তায় পর্যবসিত হয়নি মোটেও। অধিকন্তু এই নিরীক্ষাধর্মিতার কারণে *সারা দুপুর* কাব্যের কবিতাগুলো অর্জন করেছে আঙ্গিক-সাফল্য। এ-কাব্যের চিত্রকল্প বা প্রতীকগুলো কবির মানস-সংগঠনকে আত্মস্থ করেই বিকাশ লাভ করেছে। লক্ষ করা যেতে পারে একটি চিত্রকল্প:

এখন ঝড়ের আকাশ থেকে
তুলে নেব একগুচ্ছ অন্ধকার,
আর পরাবো তোমার কালো মেঘমালা খোঁপায়
তুমি খুশী হবে;
ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি
অমাবস্যা হৃদয়ে আমার!
['নতুন কবিতা': *সারা দুপুর*]

ওপরের চিত্রকল্পটিতে কবির স্বপ্নময় রোম্যান্টিক আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। 'ঝড়ের আকাশ থেকে......একগুচ্ছ অন্ধকার' তুলে নিয়ে তা কোনো একজনের 'কালো মেঘমালা খোঁপায়' পরাতে চান কবি। শুধু এই আবেগটুকু প্রকাশেই পুরো ব্যাপারটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। কবির 'অমাবস্যা হৃদয়ে' আলো জাগবে — এই যে রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেগ, তার গভীরতা ব্যাপক এবং তার মূল্য অপরিমেয়।

চিত্রকল্প ব্যবহারের পাশাপাশি *সারা দুপুর* কাব্যে আহসান হাবীব প্রতীক ব্যবহারেও সিদ্ধহস্ত। কবির প্রতীকাশ্রয়ী মানস-প্রবণতায় এক ধরনের স্থবিরতা সুস্পষ্ট এবং সেই স্থবিরতার বিপরীতে আবার জীবনের প্রবহমান সময়ের অনুষঙ্গটি বেশ ক্রিয়াশীল। 'নদী' শব্দটি প্রতীকী তাৎপর্যে অনেকানেক প্রোজ্জ্বল। 'নদী' এখানে জীবনের স্থবিরতাকে চিহ্নিত করেছে কখনো কখনো। বিশেষত 'নদী' শব্দের পূর্বে যখন 'মরা' 'দরিদ্র' 'ক্লান্ত' — এই সব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, তখন। আবার 'নদী' কখনো কখনো চলমানতার সূত্রেই জীবনের আশাবাদকেও চিহ্নিত করেছে। এ-প্রসঙ্গে কবিতাংশসমূহ লক্ষযোগ্য:

১ সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত--
আকণ্ঠ পিপাসা আজ এক বিন্দু নির্মল জলের
সে-নদীর যে-নদীর অশ্রান্ত কল্লোল
অতিক্রম করে গেছে দীর্ঘ বহু বৎসরের পথ,
['প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা': *সারা দুপুর*]

২. দেখি, চলো, নতুন নদীর তীর ঘেষে কারা হাঁটে
সামনে কার অমরতা একটি নবযুবার ভঙ্গিতে
হেঁটে যায়।
['এসো সঙ্গী হই': *সারা দুপুর*]

৩. ঘাটের
নিবেছে সমস্ত আলো
মরা নদী
নির্জনতা।
['উত্তীর্ণ প্রহরের গান': *সারা দুপুর*]
৪. এই অবারিতদ্বার
প্রেক্ষাগ্রারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে;
[ঐ:ঐ].
৫. আমি আছি এই নদী আর নদীর কল্লোলে
কান পেতে নির্ভয়;
['এই ঝড়ে অন্ধকারে': *সারা দুপুর*]
৬. দরিদ্র আমার নদী, নেই ঢেউ, দুকূল ভাসানো
স্রোত নেই, যখন হৃদয়ে বারবার শোনো তুমি
কলরোল দূর সমুদ্রের, ভয় পাই।
[ঐ:ঐ]
৭. নদীর কল্লোল আর সমুদ্রের ঢেউয়ের স্বপ্নের
পরিচর্যা পাই নিত্য
জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্লান্ত নদীতীরে
['শেষ সন্ধ্যার প্রথম উষা': *সারা দুপুর*]
৮. ভুলবো না সে নদী
যার ঢেউ উষাকালে আমাকে শুনিয়ে গেছে কলগান,
খর রৌদ্রে দিয়েছে শান্তির সুধা ;
আর দু'তীরের শ্যামল ছায়ায় আশ্রয়ের আশ্বাস।
['নজরুলকে মনে করে': *সারা দুপুর*]

তিরিশের আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনে সামগ্রিকভাবে না হলেও জীবনানন্দ দাশের কাব্যেই শুধু পরাবাস্তববাদ -এর অনুষঙ্গটি ধরা পড়ে এবং জীবনানন্দ দাশ নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন।[৮] উত্তরকালে আর কোনো বঙালি কবি পরাবাস্তব চেতনার অনুষঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন বলে মনে হয় না। তদুপরি এই অনুষঙ্গস্পর্শী বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত কিছু কবিতা রচনার প্রচেষ্টা উত্তর-কালের কবিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। *সারা দুপুর* কাব্যর 'অভ্যাগত' শীর্ষক কবিতা -টি পরাবাস্তব চেতনার অনুষঙ্গবাহী বলে বিবেচিত। প্রসঙ্গত পুরো কবিতাটি উদ্ধ-রণ প্রয়োজন:

বিজলী পাখার ব্লেড আর ফ্রিজের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
এরিয়েলের জাল বেয়ে বেয়ে
আমার অন্ধকার ঘর আলো করে সে এলো!
নরম মসৃণ আর কচি কলাপাতা রঙের এই মুখটি
আহা, কত যেন চেনা আমার।

আমার ইচ্ছে করে জানতে,
কবে কোথায় ওর সঙ্গে দেখা আমার,' ডডডডড
বিজলী বাতির বোতাম টিপে আমি তৈরী হই —
ওর মুখোমুখি হয়ে কিছু বলতে চাই;
আহা, সেই আলোর অন্ধকারে ও হারিয়ে গেলো!

হারিয়ে গেলো অথবা আমিই ওকে তাড়িয়ে দিলাম।
পুব পাশের রাস্তায় ই-পি-আর-টি-সি'র গর্জন
সাড়ে সাতটার জেট নামছে আকাশ মাটি কাঁপিয়ে
পাশের বাড়ীর আয়রভ্‌চুল মেয়েটি এই মাত্র
বাইরে বেরলো,
এয়ারপোর্টে চাকরি তার।
একটা জিপ এসে থামলো দরজায়
আশরাফ সাহেব নেমে এলেন;
এক হাতে অলিম্পিয়ার বাক্স
আর অন্য হাতে টোষ্টার।
আমার ডাক এলো নীচের অধ্যাপক বারান্দার আড্ডায়
পেপ্‌টিক আলসারের আলোচনাটা কাল শেষ হয়নি।

পাশের বাড়ীর মেয়েটির ভীরু ভীরু কড়ানাড়ার শব্দে
আমার যখন ঘুম ভাঙলো
রাত তখন আড়াইটা।
চোখ মেলে তাকাতেই দেখি
ডিস্‌টেম্পার্ড দেয়ালের সারা গায়ে
একটা হাসি যেন ছড়িয়ে আছে।
একটু ক্লান্ত সে হাসি
কিন্তু ক্লান্তি যে এমন উজ্জ্বল হতে পারে জানতাম না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ডাইনিং হলের দরজা খুললাম
ফ্রিজের দিকে তাকালাম.....
দেখতে দেখতে ফ্রিজ এরিয়েল পাখার ব্লেড
আর পাই রেডিওর সারা গা
সোফা কার্পেট আর ফ্রেমেআঁটা পিকাসো
সবকিছু মিলে একটা আমলকির বাগান হয়ে গেলো।
আমার দু'চোখ ভরে ঘুম এলো আবার;
ঘুমুতে আমি গেলাম না—'দুয়ারে অভ্যাগত।'

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, কেবল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বজাত মানুষের মনোজাগতিক চেতন অবচেতনের ব্যাপারটিই পরাবাস্তববাদী কবিতার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। মানবমনের চেতন একভাগ আর অবচেতন তিনভাগ — এর কোনোটিই বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। কারণ চেতন-অবচেতনের ভিত্তিই হচ্ছে বস্তু, বস্তুময় পৃথিবী এবং বস্তু-অভিজ্ঞতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনুযায়ী একটি ঘোড়া হতে পারে যুগান্তরের চিত্রকল্প, বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে অবশ্যই মনে হতে পারে যে, কেউ হয়তো বড় বড় কপাট খুলছে আবার বন্ধ করছে, অথবা হঠাৎ করেই চায়ের পেয়ালা হয়ে যেতে পারে বেড়ালছানার মতো একটা কিছু। এ-সব যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কিছুই নয়। কিন্তু চেতন এবং অবচেতনকে মিলিয়ে মানুষের যে স্বাপ্নিক-বিভ্রম, সে-সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।[৯]

স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতাজাত চেতন-অবচেতন মনের বৈগুণ্য ও স্খলন প্রক্রিয়াই নিত্য-নতুন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে দ্যুতিময় এবং তা প্রকাশ করে মগ্ন-

চৈতন্যের আপাতবিশৃঙ্খল ঘটনা-প্রবাহ। 'অভ্যাগত' শীর্ষক কবিতার শুরুতেই যে-এলো অন্ধকার ঘর আলো ক'রে, সে আর বেশিক্ষণ থাকলো না ওই ঘরে। এমনকি তার আসবার ঘটনাটিও আস্বাভাবিকত্বে হয়ে ওঠে ভরপুর। এমন সময় হঠাৎ করেই ই-পি-আর-টি-সি'র গর্জন হলো, জেট্-এর আকাশ মাটি কাঁপানো শব্দ হলো, 'পাশের বাড়ীর আয়রভ্‌চুল মেয়েটি' এয়ারপোর্টে যাবে বলে তৈরি, অলিম্পিয়ার বাক্স এবং টোস্টার হাতে জিপ থেকে নেমে এলেন আশরাফ সাহেব। আর পেপ্‌টিক আলসারের অসম্পূর্ণ আলোচনার জন্যে নিচের অধ্যাপক-বারান্দায় কবির ডাক এলো। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এ-পর্যন্ত যা ঘটে গেলো এ-কবিতায়, তার মধ্যে এক ধরনের পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় যে সময়-অতিক্রমণের প্রয়াস, সেখানে সহজেই ধরা পড়ে অসংলগ্নতা বা যুক্তিহীনতা। কারণ রাত্রিকালীন অন্ধকার ঘরের স্বপ্নবিহার আর সকাল সাড়ে সাতটার যন্ত্র-দানবের চিৎকারের ঘটনাবলী যতই শৃঙ্খলা দাবি করুক না কেন, এর সব কিছুই মুহূর্তে চুরমার হয়ে যায় যখন 'পাশের বাড়ীর মেয়েটির ভীরু ভীরু কড়ানাড়ার শব্দে' কবির ঘুম ভাঙে। অর্থাৎ এ-যাবৎ যা ঘটেছে তা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নরাজ্যেই ঘটেছে। স্বপ্নরাজ্যের এই ঘোর কাটতে না কাটতেই কবি আবার দেখেন— 'ডিস্‌টেম্পার্ড দেয়ালের সারা গায়ে একটি হাসি যেন ছড়িয়ে আছে।' এমনকি দেখতে না দেখতেই ফ্রিজ-এরিয়েল-পাখার ব্লেড-পাই রেডিওর সারা গা-সোফা-কার্পেট-ফ্রেমে আঁটা পিকাসো, সব মিলিয়ে হয়ে ওঠে একটা আমলকির বাগান। এ-সবের পেছনে কোনোই যুক্তি নেই, কিন্তু মগ্নচৈতন্যের অনিবার্য ক্রিয়া বিক্রিয়ায় কোনো কিছু হঠাৎ করেই দাবি করতে পারে কোনো এক ধরনের বাস্তবতা, কবির চৈতন্যে যা সঞ্চার করে তীক্ষ্ণ বোধের এবং যার আবেদন তর্কাতীতভাবে হয়ে ওঠে কালাতিক্রান্তী।

।। চার ।

ষাটের দশকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের রক্ত-ফেনিল উদ্দামতার এক ঐতিহাসিক সময়ে রচিত হয়েছে আহসান হাবীবের *আশায় বসতি* (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলো। গ্রন্থের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন: ''উল্লেখ প্রয়োজন, দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে ; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এ বই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'' সুতরাং কালনির্ণয়ের প্রশ্নে রচিত কবিতাগুলোর প্রসঙ্গে স্পষ্টতই একটা সীমারেখা টেনে দেয়া যায়। বাঙালির জাতিসত্তা নির্ণয় এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিলো মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই, যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের

১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তানমুক্ত করার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৪-তে *সারা দুপুর* কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ — এই দীর্ঘ সাতটি বছর ধরে *আশায় বসতি* কাব্যের কবিতাগুলো রচিত হয়েছে এবং এই সময় কালেই বাঙালির ৬ দফা আন্দোলনসহ ঘটে গেছে আইয়ুব-বিরোধী গ-অভ্যুত্থান, যা ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে পুনর্বার রক্তাক্ত হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। নির্লিপ্তির রুদ্ধদ্বার জগতে বিচরণ ক'রে এ-কাব্যে আহ্সান হাবীব শুধু মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেই সম্বল করলেন পাথেয় রূপে। নিতান্ত আটপৌরে জীবনের অনায়াস-উচ্চারিত এক সত্যকে কবি একাশ করলেন *আশায় বসতি* কাব্যের প্রথম কবিতায়:

আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙক্ষা নেই। কোনো মসৃণ
সদয় দীর্ঘ মই
আমার আয়ত্তে নেই। নেই
রৌপ্যাধারে সবুজ পানের খিলি তাই
তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই কিছু পৃথিবীতে, আমি
পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ
উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত। এক
নিরীহ সংসারী আমি, নির্বিবাদী আর
জীবনে তেমন কোনো চমকপ্রদ দর্শনের অভিমান নেই।
['নৈঃশব্দে নিহিত আমি': *আশায় বসতি*]

ষাটের দশকের বিক্ষুদ্ধ গণ-জোয়ার এবং স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির সীমাহীন স্পৃহা তথা অঙ্গীকার ছিলো পর্বতপ্রমাণ। এই সময়ের উত্তপ্ত রাজনৈতিক সকল ঘটনাই বাঙালি জাতিকে নানাভাবে প্রেরণা দিয়েছে। অথচ আহসান হাবীব আপন বৃত্তে শুধু 'কথার কাঙাল' হয়েই ছিলেন। মধ্যবিত্তের 'তেমন কোনো উচ্চাকাঙক্ষা' নাও থাকতে পারে, অথবা নাও থাকতে পারে পৃথিবীতে 'তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও।' কিন্তু—

আমি
'পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ,
উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত।

এমন উচ্চারণ মধ্যবিত্তের কাছ থেকে আশা করা যায় না। এ-উচ্চারণ অকপট বটে, কিন্তু তা বহুলাংশেই রূঢ়। আমরা জানি, ১৯৪৭-পরবর্তী সকল সামাজিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙালি মধ্যবিত্তের অবদান অবিস্মরণীয়। অথচ আহসান হাবীবের এ-উচ্চারণ উত্তরাধিকারের কাছে বিতর্কিত বিশ্বাস এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে তাঁর আপাতজটিল মানসিকতার পরিচয়কে উন্মোচিত করেছে। আর্থ-সামাজিক অসঙ্গতির দরুণ হতাশাদীর্ণ মধ্যবিত্তের মাঝে পলায়নপর মনোবৃত্তি প্রবল হয় কখনো কখনো, কিন্তু তা অবশ্যই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার ক'রে নয়। পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতে যে-আশাবাদ ও সামাজিক অঙ্গীকারের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে, সেই ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হয়ে এ-কাব্যের শুরু-

তে পাঠককে যেন হোঁচট খেতে হয়। দেশব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রাম-বিক্ষোভ, জনতার পদভারে প্রকম্পিত রাজপথ; অথচ আহসান হাবীব বিস্ময়করভাবে 'নৈঃশব্দে নিহিত' থাকলেন। কাব্যের মুখবন্ধ পাঠ ক'রে কবিতাসমূহ রচনার কালগত যে-পরিচয় পাঠক লাভ করে এবং কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঠকমন আগাম যে-প্রস্তুতি গ্রহণ করে, কাব্যান্তর্গত প্রথম কবিতার শিরোনামাতেই পাঠকের সেই প্রত্যাশা প্রতিরুদ্ধ হয় বৈকি! তবু মধ্যবিত্ত চরিত্রে সংগ্রামশীলতা ও পলায়নপর মনোবৃত্তির সমান্তরাল অবস্থানের অনিবার্যতা পাঠকের প্রত্যাশা ও আশাভঙ্গকে এক শিল্পতাত্ত্বিক মীমাংসায় পৌঁছে দেয়।

আশায় বসতি কাব্যের প্রথম কবিতায় আহসান হাবীবের চিত্তবৈষম্যগত স্খলন পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক মানস-প্রবণতা ব্যাহত হয়নি মোটেও। অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের কাঠামোয় আহসান হাবীব নিজের আটপৌরে জীবন ও সংসারের প্রতিচ্ছবি তুলে আনতে চাইলেন এবং একই সঙ্গে কবির একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্য মূর্ত হলো কবিতায়:

> তবু এই নৈঃশব্দের নির্মম তাড়ায়
> সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন
> যেন নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক।
> ['নৈঃশব্দে নিহিত আমি': *আশায় বসতি*]

কবির অনুভূতিতে 'নৈঃশব্দ' শক্তিধর কোনোকিছু হিসেবে বিরাজিত যেন। কবি যেন 'নৈঃশব্দের' সাম্রাজ্যে এসে অন্যায়ভাবে কোনো কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। 'শব্দ'কেই হয়তো খুঁজছেন কবি, যা শুধু 'নৈঃশব্দেরই' প্রতিপক্ষ। কিন্তু কবি তো শব্দ চান না, কথার কাঙাল তিনি। তবু 'নৈঃশব্দের নির্মম তাড়ায় সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ' ক'রে কবি ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিপর্যস্ত। সেই বিপর্যস্ততা, সেই একাকিত্বের কথা বলা হলো এভাবে — যেন নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক।' কবিতাংশটি শুধু চিত্রকল্পের উদাহরণ হিসেবেই ঋদ্ধ নয়, অনেকাংশেই তা সাংগীতিকও বটে। অন্তত শেষ চরণের গীতলতা শ্রুতিকে সচল রাখে দীর্ঘ সময়।

আশায় বসতি-র পরবর্তী ত্রিশটি কবিতায় আহসান হাবীবের স্রষ্টামনন সহজাত। তবে সৃষ্টির প্রেরণায় সেই স্রষ্টামনন কখনো অতীতচারী, কখনো বর্ত-মানের সমাজ-অস্তিত্ব সংলগ্ন। কবি কখনো দেশজ পরিমণ্ডলকে সাঙ্গীকৃত করেন তাঁর কবিতায়, আবার কখনো তিনি আপন প্রতিভাস্পর্শে হয়ে ওঠেন বৈশ্বিক। এ-প্রসঙ্গে কবি অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত এবং সমিল প্রবহমানতার দৃষ্টান্তও রেখেছেন। 'স্বগত', 'কাহিনী নিরন্তর,' 'সামনে ধু ধু নদী,' 'মায়ের ডাকের ছড়া,' — এইসব কবিতায় আহসান হাবীব প্রকৃতই 'ছন্দোরীতির নিরীক্ষাকে' সামনে রেখেছিলেন। কিন্তু স্তবক-বিন্যাসরীতি এবং কবিতার চরণ ভাঙার খেলাটিই যেন তাঁর কাছে মুখ্য ছিলো। নিচের কবিতাংশ লক্ষ্য করবার মতো:

জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও।
চোখের সামনে কে দোলায় কালো কালো
মলিন পর্দাটা
পর্দা তুলে দাও।
দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূতটাকে
রেখো না পাহারায়
আমার দরজায়;
বাইরে ঝড় বয়
বোলো না মিথ্যে
বোলো না ঢেউ তুলে
নদীরা গর্জায়।
['**স্বগত**': *আশায় বসতি*]

সাত মাত্রার সমিল প্রবহমানতা এখানে লক্ষণীয়। আবার বারো মাত্রার সমিল স্বরবৃত্তে বক্তব্য প্রকাশেও কবি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাহিনী নিরন্তর' কবিতায় সেই প্রয়াস খুব স্পষ্ট। কবিতাটিতে আছে মোট ন'টি স্তবক। একেকটি স্তবক তিন-চরণে সজ্জিত। এবং তিন-চরণের অন্ত্যমিলে স্তবকসমূহ এক ধরনের বিশিষ্টতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। লক্ষণীয় নিচের কবিতাংশ:

দিন গেলো আর রাত গেলো তার উজান *ঠেলে*।
হয়ত ভরা নদীর মাঝে বৈঠা ফেলে
ঠায় বসে তার কাটছে বেলা উজান *ঠেলে*।
['কাহিনী নিরন্তর': *আশায় বসতি*]

এই অন্ত্যমিলের প্রবণতা 'সামনে শুধু নদী' শীর্ষক কবিতায়ও পরিদৃষ্ট হয়। তবে চরণ, স্তবক, মাত্রা ও ছন্দোরীতি নিরীক্ষার সমূহ আয়োজন 'মায়ের ডাকের ছড়া' কবিতাকে কেন্দ্র করেই সফল হয়েছে। এ-কবিতায় আছে একই সঙ্গে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উপস্থিতি। চরণ-বিন্যাস ও স্তবকগঠনেও নতুনত্ব বিদ্যমান এ-কবিতায়। উল্লিখিত কবিতাসমূহে একদিকে কবির মনোলৌকিক যন্ত্রণার ব্যাপকতা, আরেকদিকে আশাবাদের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। নিরন্ধ্র অন্ধকার গুহার দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় কবি আলোর জগৎকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন ব্যাকুলভাবে। আলোকের সেই প্রত্যাশা চমৎকারভাবে আশাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে:

বিজন নদী নদীর ঘাটে কি অন্ধকার।
আলোর পথে বিছায় কাঁটা কোন দুরাচার।
তবু আশার আলোর শিখা নেবে না কার।

তার দু'চোখের আশার আলো উঠোন ভাঙে,
আলের পথে যায় এগিয়ে ঘাটের গাঙে
ঘাটের পথে রোজ সে আলো উঠোন ভাঙে।
['কাহিনী নিরন্তর': *আশায় বসতি*]

আশাবাদের এই ব্যাপারটি আহসান হাবীবের কাব্যে পূর্বাপর বর্তমান। *আশায় বসতি* কাব্যের প্রথম কবিজ্ঞ পাঠককে হতাশ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবিচেতনার আশা-

বাদে উত্তরণ-প্রক্রিয়া সেই বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতীক-রূপক ব্যবহারে কাব্যশরীর যেমন সংহতরূপ-লাভ করে, তেমনি তা কবির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুত কবিতার কালোত্তীর্ণ অভিব্যঞ্জনার মাত্রা প্রকাশে প্রতীক রূপকের ব্যবহার শিল্পকৃতিরই উচ্চাঙ্গ প্রয়াস। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, আহসান হাবীবের কবিতায় প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা বা প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর সচেতনতা। *আশায় বসতি* কাব্যের 'সেই নদী', 'সামনে ধু ধু নদী, 'বাস নেই', 'নদীকে সামনে রেখে' কবিতাগুলো লক্ষ্য করবার মতো। কবিতাগুলোর নামকরণের পশ্চাতে কবিচিন্তায় এক ধরনের বোধ কাজ করেছে, যা বর্তমানের কবিকে কখনো অতীতমুখী করেছে আবার কখনো তাঁকে নিয়ে গেছে ভবিষ্যতের চলমানতায়। উল্লিখিত চারটি কবিতার তিনটিতেই ব্যবহৃত হয়েছে 'নদীর' প্রতীক। অস্থির ও বিপর্যস্ত বর্তমানের অবরুদ্ধতায় কবি সহজেই তাঁর চেতনাকে অতীতমুখী করেন এভাবে:

তোমার কি মনে পড়ে
আমরা ক'জন আমরা সবাই বিকেলে
উঠানের পুব পাশে আমলকির ছায়ায় দাঁড়িয়ে
সেই নদী দেখতাম ভাবতাম কোনো অপরূপ নর্তকীর মত
সে যেন প্রত্যহ কোনো পরীর দেশের সুর
বেঁধে নিয়ে পায়ের ঘুঙুরে আসে যায়;
[*'সেই নদী':আশায় বসতি*]

নস্টালজিয়াক্রান্ত কবি 'নদীর' প্রতীক অবলম্বন করে ফিরে গেছেন তাঁর অতীতে। নদীর প্রতীকে জীবন ও জগতের চির-চলার বক্তব্যটি যেমন উল্লিখিত কবিতাংশে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে তেমনি এ-কবিতাংশ একটি সার্থক চিত্রকল্পের উদাহারণ হিসেবেও সফলতা অর্জন করেছে। অতীত স্মৃতির যে-নদী ধরা দিয়েছে কবিচিন্তায়, তার রূপ-বৈশিষ্ট্য পেলব-শান্ত অথচ ঐশ্বর্যময়। কিন্তু যখনই কবি অতীত থেকে দৃষ্টি ফেরালেন সম্মুখে, তখনই তাঁর দৃষ্টির সাম্রাজ্য হয়ে উঠলো বিরান, বন্ধ্যা ও জ্বরাগ্রস্ত। আর তাই অন্তঃসারশূন্য ও অস্থির ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কবিতার শিরোনামায় কবি দার্শনিকের মতো ব্যবহার করলেন 'ধু ধু' বিশেষণটি, যে-বিশেষণ বস্তুত নেতির তাৎপর্যকেই বহন করে প্রতিনিয়ত। 'ধু ধু' বিশেষণ-সহযোগে কবিতার পূর্ণ শিরোনামা হলো 'সামনে ধু ধু নদী।' বর্তমানের অস্থির এবং দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি দিক্‌নির্দেশনাহীন এক তামসিক ভবিষ্যৎকে অবলোকন করেছেন এ-কবিতায়।

আবার 'বাস নেই' কবিতায়ও একইভাবে চির-চলমানতার কথাই বলা হয়েছে। এ-কবিতায় সামনে চলার এক সুগভীর আকূতি প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু ব্যর্থতাও কম বাস্তবিক নয়। বাস-এ চড়বার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশটি এ-রকম :

একটিবার
কেবল একটিবার। একটিবার বাস-এ চড়ে
যথাযথ গন্তব্যে পৌছবো। আর যথাযথ সময়ে।
['বাস নেই': *আশায় বসতি*]

কিন্তু নির্মম বাস্তবতার কাছে সকল স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা বারবার ধূলিসাৎ হয়েছে এভাবে:

তবু বাস
হায়, সেই মোহনবাহন
কি নির্মম বিদ্রূপের ঘন্টা নেড়ে চলে গেলো দূরে বারবার
আমাকে নিলেনা
[ঐ : ঐ]

এই ব্যর্থতাবোধ বা দুঃখবোধই কবির মানস-বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই বোধস্পর্শী উচ্চারণে জগদ্বিখ্যাত কোনো সাহিত্যকীর্তির প্রকাশ না ঘটলেও ইতোমধ্যে কবির চিন্তা ও বিশ্বাস যে মানুষের জীবন-অস্তিত্ব সংলগ্ন হয়েছে সে-পরিবর্তনও কম সদর্থক নয়। একটা দুর্বোধ্য ও জটিল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও মহৎ মনুষ্যজীবনের চিরচলার প্রসঙ্গেই কবি হয়ে উঠলেন কৃতধী এবং বললেন :

বাসহীন পৃথিবীতে আমি তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। আর
ভাবতে পারি এখন পরার্থপর ভাবনা কিছু......
[ঐ : ঐ]

জীবন ও সমাজ প্রসঙ্গে কবিচিন্তার এই সদর্থক উত্তরণ ছিলো পাঠকের জন্যে প্রত্যাশিত। 'বাস'— এর প্রতীকে গতিময় জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবির চিন্তা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বস্তুত সমাজমনস্ক কবি কিংবা শিল্পীমাত্রেই ব্যক্তির সমাজ-সম্পৃক্তিকে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে একটি মহৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষণ বলেই বিবেচিত করেন, যার পরিণতি সামূহিক (Collective) জীবন-জিজ্ঞাসায় ভাস্বর হয় সার্বিক বিবেচনায়।

প্রকৃতপক্ষে *আশায় বসতি* কাব্যগ্রন্থ কবির মানসচৈতন্যের অনিবার্য প্রবাহসূত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, যা সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিজীর্ণ সংরক্ত সময়কে অস্বীকার করতে পারে নি। সমাজ-সচেতন একজন কবি সামাজিক অঙ্গীকারের কারণে তাঁর লালিত স্বপ্নাবেগ কেবল সুন্দর ও কল্যাণের সূত্রেই প্রকাশ করতে চান। জীবনের অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁকে সমষ্টির সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতেই হয়। ইতিহাসের কাল-পরিক্রমায় ষাটের দশকে বাঙালির জাতিসত্তা নির্মাণ-আকাঙক্ষা ছিলো এক অনিবার্য ব্যাপার। সুতরাং বাংলাদেশের মাটি ও জলের সঙ্গে বাঙালি জাতির যে রক্তের সম্পর্ক, তারই দুর্নিবার আকর্ষণে কেবল সমগ্র জাতি উজ্জীবিত হয়েছিলো পার্বতিক দৃঢ়তায়। জনতার স্রোতে শুধু কবিই নন, কবিতাও মিশে গিয়েছিলো সেদিন স্বাধিকারের উজ্জ্বল মহিমায়।

রাজপথের মিছিল ছিলো সেদিনের জাতির হৃৎস্পন্দন। কবির লেখনী তুলে এনেছিলো সেইসব তপ্ত সময়ের রক্তবর্ণ ছবি:

সূর্যের দীপ্তিতে আঁকা মিছিলের মুখগুলি দেখো
দেখো দৃপ্ত বুক তার
দেখো তার পায়ের রেখায়
দেশের প্রাণের বন্যা উচ্ছল উত্তাল।

মিছিলের মুখ–দেখো
দেখো তার সারা মুখে দেখো
দেশের আত্মার আভা;
দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ
অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।
['মিছিলে অনেক মুখ': *আশায় বসতি*]

এই সব ছবিই হলো বাঙালি জাতির বীরত্বের এক ঐতিহাসিক বিন্যাস, যার শৈল্পিক আবেদন অখণ্ড কোনো জীবনবোধকে স্বীকার করে। সমগ্র জাতির মুক্তির ইঙ্গিত কবি খুঁজে পেয়েছিলেন ওই 'উচ্ছল উত্তাল' জনতার মিছিলে। বস্তুত আশাবাদই হচ্ছে *আশায় বসতি* কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। বাঙালির জাতীয় জীবনে হতাশা আর বঞ্চনার কশাঘাত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলো তৎকালে। কোনো কিছুই কবির সংবেদনশীল দৃষ্টিতে এড়ায়নি। তবে হতাশা বঞ্চনা আর ব্যর্থতাবোধকে ছাপিয়ে বাঙালি জীবনের প্রচণ্ড আশাবাদের রূপায়ণেই *আশায় বসতি* কাব্যের বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ-কাব্যে 'জোয়ারের জলে ভেসে ভেসে' নিশ্চিত ডুবে যাওয়ার করুণ পরিণতির কথা আছে, 'ক্ষুধার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচবার' আকৃতিও আছে, আছে শোকার্ত মানুষের অস্ফুট উচ্চারণ — ; কিন্তু যা আছে-অধিক উজ্জ্বল হয়ে তা হলো প্রগতির পক্ষে এক অসাধারণ উচ্চারণ:

সে বলে
ধাবমান যৌবনের প্রতিনিধি
আমি এক অগ্রগামী পথিক, আমাকে
পুরাতন নিমন্ত্রণে পারে না ভোলাতে
কেউ পারে না ফেরাতে।
['ডাক': *আশায় বসতি*]

পুরাতন বিশ্বাস আর সংস্কারের বিরুদ্ধেই বস্তুত এই উচ্চারণ। পৃথিবীর ধর্মও তাই; শুধুই সামনে চলা, পেছনে নয়। প্রগতির ধারায় কবির মানসচৈতন্য পুনর্বার সমষ্টিকে অঙ্গীকার করেছে বলেই কবি আর রাজনীতির দর্শকমাত্র নন, মুক্তির মিছিলেই তাঁর উত্তরণ :

আমি যাকে ডাক দেবো সঙ্গে নেবো
সে আমার অনেক আগেই
মিছিলে শামিল, আমি
তারই সঙ্গী, সে আমাকে লজ্জার মুকুট পরিয়েছে।
[ঐ : ঐ]

প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি ও সমাজের অভিক্ষেপের বিপরীতে শিল্পীর দায়িত্ববোধ অনিবার্য বলেই এক ধরনের সদর্থকতা সহজেই মূর্ত হয়ে ওঠে। যেহেতু আহসান হাবীব তাঁর সময় ও সমাজকে অস্বীকার করেননি সেহেতু তাঁর বিশ্বাসের বেলাভূমিতে বারবার জেগে উঠেছে আশাবাদের পলিদ্বীপ। নৈরাশ্য আর অপূর্ণতার তামসিক পরিস্থিতিতেও মানুষ আর মানবিক সত্তাই কবির সৃষ্টিকর্মের প্রধান প্রসঙ্গ। একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকেও চৈতন্যের ব্যাপ্তি ও বিশুদ্ধতায় কবি হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক। ঠিক তখনই নিরালঙ্কার এক পরম সত্য উচ্চারিত হয় এ-ভাবে —'শিল্প মানুষের জন্য মানুষ শিল্পের জন্য নয়। [১০]

॥ পাঁচ ॥

বাঙালি জাতির আত্ম-আবিষ্কারের চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ — অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘ চার বছর পর ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আহসান হাবীবের *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ *আশায় বসতি* ১৯৭৫-এ প্রকাশিত হলেও *আশায় বসতির* কবিতাগুলো ষাটের দশকের তপ্ত সময়ে রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত কবিতাসমূহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে মূলত *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যগ্রন্থে। সুতরাং এক অর্থে স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত ও প্রকাশিত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো।*

বাঙালি-চৈতন্যের মর্মমূলগত দূরসঞ্চারী উৎকর্ষই তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম কারণ। স্বাধীনতার স্পৃহা আর ইতিহাস ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার এক মহান দায়িত্ববোধের কারণেই ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি, বরং ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনমূল্যে অকুতোভয় জাতি স্বাধীনতার সোনালী সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলো সেদিন। বিশ্ব-ইতিহাসের এই স্বর্ণোজ্জ্বল প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* গ্রন্থের কবিতাগুলো। তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বলা যায়—, এ-কাব্যের কবিতাগুলো সমকালকে ধারণ করলেও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ অল্পসংখ্যক কবিতায় উপস্থাপিত। অন্য কথায়, স্বাধীনতা উত্তরকালে রচিত কবিতাসমূহে শুধুই মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে নি।

এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আহসান হাবীবের কবিতা তাঁর সমকালকে ধারণ করেছে। সুতরাং স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির আকাঙ্ক্ষিত সদর্থকতার বিপরীতে সমাজচরিত্র যে-রকম কলুষপ্রাপ্ত হয়েছিলো, সহজ ভাষায় যা হলো 'খুন-গুম-রাজনৈতিক হত্যা-লুণ্ঠন-ব্যাঙ্কডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি-জাতীয় নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা' [১১]— স্বাধীনতা-উত্তরকালে এইসব চারিত্রিক স্খলন ও জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই ঘটেছিলো বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের প্রথম সূত্রপাত। আজ স্বাধীনতা অর্জনের কুড়ি বছর পরও স্বাধীনতার তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি, বরং স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় বেড়েছে ব্যাপকভাবে। এইসব

সামাজিক-রাজনৈতিক অসঙ্গতির অনুষঙ্গ তাৎপর্যসহ রূপক-প্রতীকে প্রকাশ করেছেন আহসান হাবীব তাঁর কাব্যে। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের প্রথম কবিতা 'আমারত কোথাও না কোথাও যেতে হবে।' কবিতাটিতে হৃদয়ের রক্তক্ষরণের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তনের পরও কবির মানসভূমি ছিন্ন, দীর্ণ, বিপর্যস্ত। স্বাধীনতার তাৎপর্য যেহেতু ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে হয়েছে ভূলুণ্ঠিত, সেহেতু আর বসে থাকা নয়। সমাজ পরিবেশ কবিকে বিচলিত করে তুলেছে, অথচ তাঁকে চলতেই হবে:

আমি এক বিচলিত মানব সন্তান একালের
আমাকে হাঁটতে হবে
দুটি পা রক্তাক্ত হবে
এ' শরীর জ্বলতে থাকবে
চলতে চলতে তবুও আমাকে
একটা নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে হবে বলে
হাঁটতে হাঁটতে এগোতেই হবে।
[আমারত কোথাও না কোতাও যেতে হবে': *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*]

মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির কথা। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের জন্যে ব্যাকুল কবিচিত্তের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যার সুর ও ব্যঞ্জনা নিতান্তই প্রাতিস্বিক এবং তা পুরোপুরি রোম্যান্টিক আবহস্পর্শী। উদ্দেশ্যহীন চলার কথা আহসান হাবীবেও বর্তমান, কিন্তু তা পরিশেষে চূড়ান্ত কোনো বোধকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি'— এ-বলেই রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা তথা *সোনার তরী* কাব্য শেষ হয়েছে এবং এ-অপ্রাপ্তির মধ্যেও কবির আত্মতৃপ্তি তথা সীমাহীন সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাপারটি অসীমের পানে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু আহসান হাবীবের কবিতা সেই নিরন্তর সৌন্দর্যাভিসারকে স্বীকার না করলেও তাঁর কবিতার পরিসমাপ্তিতে আছে এক ধরনের চূড়ান্ত বোধ, যা সময় ও সমাজের পটভূমিতে মানুষের প্রয়োজনচেতনাকে বড় করে দেখেছে:

আমি এই পথ থেকে ফিরবো না, কেননা
মানুষকে কোথাও না কোথাও যেতেই হয়
স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস তাকে
অবশ্যই গড়ে নিতে হয়
কোনোখানে
[ঐ : ঐ]

পরবর্তী কবিতা 'এক দুই তিন' এবং এ-কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কবিতাটির পর্ববিভক্তি। পৃথক পৃথক তিনটি পর্বে তিন ধরনের বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে রূপকের মাধ্যমে। প্রথম পর্বে পড়ে থাকা আয়নায়:

ভাঙ্গাচোরা টুকরোয় বিম্বিত
করুণ রক্তাক্ত মুখ

হাত-পা-ভাঙা
একটি বয়স্ক অবয়ব।
['এক দুই তিন': ঐ]

প্রকৃত অর্থে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের নগ্ন, বিকৃত ও বিপর্যস্ত চেহারার কথাই বলা হয়েছে কবিতাংশের মধ্য দিয়ে। আর দ্বিতীয় পর্বে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের অনুষঙ্গঃ

যখন পথিক সুজনকে ডেকে ডেকে
বললাম আমাকে কিছু ভালোবাসা দাও
'কড়ি দাও' বলে লোকটা
হাত পেতে দিলো।
[ঐ : ঐ]

কবিতার তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্বে কবির আত্ম-অনুসন্ধান ও জাতিসত্তা-অনুসন্ধানের অনুষঙ্গটি যথার্থই পরিস্ফুট হয়েছে :

দিশেহারা কাঠবেড়ালী একবার মগডালে যায়
আর একবার গাছের তলায়
ছটফট ছোটাছুটি
ছুটে ছুটে প্রাণান্ত তবুও
আপন নিবাস
খুঁজে খুঁজে কোথাও মেলে না।
[ঐ : ঐ]

বস্তুত কবিতাটির তিনটি পর্বেই রূপকের আড়ালে যা উৎকীর্ণ, তা সমাজ-অভিজ্ঞতা প্রসূত নেতিচিত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। কবিতাটির পর্বক্রমে কাহিনীভিত্তিক কোনো কিছু পরিবেশিত না হলেও অন্তর্নিহিত অভিব্যঞ্জনায় পর্বগুলো তাৎপর্যপূর্ণ।

একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রবল আকাঙক্ষা এ-কাব্যের প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে পরিদৃষ্ট হয়। এমন কি এই প্রবল প্রত্যাশা বারংবার ব্যর্থই হচ্ছে এবং এই ব্যর্থতার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না কবির পক্ষে। 'কড়ি গুণতে গুণতে' শীর্ষক কবিতায় 'খেয়া সরে গেছে অনেক দূরে, দূরে নদী অনিঃশেষ, যেন নির্দিষ্ট দিগন্ত নেই কোনো।' অথবা 'খেয়া নৌকা বার বার ছেড়ে ছেড়ে যায় তোমাকে রেখেই,'— এই সব ঘটনা একজন মানুষের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তারই জীবনের পটভূমিকায়। জীবনপটের এই ব্যর্থতাকে আঁকবার জন্যে কবি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন।

এবারের অনুষঙ্গ বর্ষা আর বর্ষাতীর। দুই কাব্যের দুটো কবিতায় এ-অনুষঙ্গটি আশ্চর্যরকমের সেতুবন্ধ রচনা করেছে, যার প্রতীকী তাৎপর্য কালগত বিচারে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। *রাত্রিশেষ* কাব্যের 'রেনকোট' শীর্ষক কবিতায় বর্ষা ও বর্ষাতীর প্রথম সাক্ষাৎ মেলে এবং 'রেনকোট' কবিতায় বর্ষা' জীবনের শূন্যতা ও হাহাকারকে চিহ্নিত করেছে; আর 'বর্ষাতী' সেখানে সহজেই হয়ে উঠেছে স্বপ্নের প্রতীক: [১২]

বর্ষণক্লান্ত বাইরের পানে তাকিয়ে
হঠাৎ এ কথা মনে হয়েছেঃ
একটা রেনকোট যদি থাকতো আমার।
['রেনকোট': *রাত্রিশেষ*]

এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্য দিয়েই কবিতাটি শেষ হয়েছে। অথচ কবি বিস্মৃত হননি জীবনের সুদীর্ঘ তিরিশ বছরেও কবিতাটির অনুষঙ্গ এবং কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকী শব্দটি। কবির প্রথম কাব্য প্রকাশের তিরিশ বছর পর একই অনুষঙ্গ অন্য এক কবিতায় তুলে আনলেন এবং স্মৃতিধর কবি বললেনঃ

আমি একটি বর্ষাতীর প্রার্থনা জানিয়ে
তিরিশ বৎসর আগে যত্রতত্র আবেদনলিপি
পাঠিয়েছি। ডাকবিলি হয়েছে কি হয়নি জানিনা
তবু উত্তরের আশায় এখনো বসে আছি
টলেনি বিশ্বাস।
['বর্ষা বিষয়ক কবিতা: কায়সুলকে' /*ঐ*]

এখানে বর্ষার চেয়ে তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে 'বর্ষাতী' শব্দটি এবং এ-শব্দটি এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, এখন তা ইতিবাচক কোনো জীবনাকাঙ্ক্ষারও প্রতীক হয়ে উঠেছে। কালের ব্যবধানে প্রতীকী শব্দটি পুনরায় ব্যবহৃত হলো ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে:

কখন কখন
অলৌকিক ফেরিওয়ালা কোনো
আসবে আর ঘুরে যাবে আমার তোমার আর
আমাদের সব স্বজনের ঘরে ঘরে
স্নিগ্ধ স্বরে ডেকে যাবে 'চাই
বর্ষাতী......বর্ষাতী!'
[*ঐ* : *ঐ*]

আধুনিক বাংলা কবিতার একটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য এই যে, তা বিদেশী শব্দকে অনায়াসে ধারণ করতে পারে তার আপন দেহে। ব্যবহৃত সেইসব শব্দ কখনো প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়, কখনো তা ধ্বনিময়তার প্রসঙ্গে নতুনতর আবেদন সৃষ্টি করে। আবার কখনো কবিতার পরিপ্রেক্ষিতকে পাঠকের কাছে পরিচিত করতে তার ব্যাবহার জরুরি হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের কয়েকটি কবিতা আলোচনার দাবি রাখে। অন্যতম একটি কবিতার শিরোনামা হচ্ছে 'মনীষা মনীষা বলে।' এ-কবিতায় 'বাইজান্টাইন' 'নাইল' 'তৈমুর' 'বেঞ্চ' 'হাইড পার্ক' 'পল্টন' 'নাপাম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে কবিতাটি নিঃসন্দেহে বিশেষ দ্যোতনা অর্জন করেছে। এইসব শব্দ ব্যবহারের ফলে কবিতার পরিপ্রেক্ষিত প্রাচ্য থেকে সহজেই বিস্তার লাভ করেছে দূর প্রতীচ্যে। প্রাসঙ্গিক অপর কবিতা 'আসামী বিষয়ক' শিরোনামার। কবিতাটি সমাজ-বাস্তবতার এক নিখুঁত চিত্র, যে-সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাস মানুষের মাঝে গড়ে তুলেছে কবির ভাষায় 'দুর্ভেদ্য কালো

দেয়াল।' আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে কবি সমাজ-অভ্যন্তরের যাবতীয় অসামঞ্জস্য দেখেছেন বলেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই চিত্র প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এ-ভাবে:

'ভেবেছেন কোনোদিন এইসব মহানমহীম ক্রেতা কারা
কোথায় নিবাস এই বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত দরিদ্র দেশে
কারা সেই কালো দেয়ালের অসামান্য কারিগর কারা
নিত্য নব আয়োজনে নবনব কৌশলে ক্রমশ:
এমন দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলে দেয়াল কেবল
সারি সারি'

['আসামী বিষয়ক' :ঐ]

সহজ উত্তর— মানুষ। 'আশরাফুল মখ্‌লুকাত'খ্যাত রক্ত মাংসের মানুষই এই 'কালো দেয়াল' গড়েছে সভ্যতার আদি থেকে। এ-কর্ম পুরাণখ্যাত বিশ্বকর্মার নয়, কিংবা নয় তা মনুষ্য-কল্পিত স্রষ্টারও। প্রসঙ্গত কবিতায় উল্লিখিত 'কালো' শব্দটির প্রতীকী তাৎপর্য নির্ণয় আবশ্যক। বস্তুত 'কালো' রঙের প্রতীকী তাৎপর্যে প্রকাশ পেয়েছে অশুভ, অকল্যাণকর তথা অমানবিকতার ইঙ্গিতবহ দিকগুলো। এমনকি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভক্তি-নির্দেশক অদৃশ্য সেইসব দেয়ালকে 'কালো' বিশেষণে বিশেষিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

গদ্যঢঙের ভাষা-বিন্যাস এবং সংলাপধর্মিতার গুণে এই কবিতাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সংলাপধর্মিতার কারণে মনে হয় যেন সমাজ-অভিজ্ঞ কেউ ক্রমাগত বর্ণনা করছে সমাজেরই 'সাধারণ মানুষ আর ভূঁই ফোড় উচ্চবিত্তের' চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।এ-কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে কিছু বিদেশী শব্দ, যেমন— পফলিনের শার্ট, শপিং, বিনিথ ডিগনিটী, ড্রাইভার, শো-কেস, শেভিং ক্রিম ইত্যাদি যা কবিতার ভাষাকে দান করেছে এক ধরনের গতিময়তা। অনুরূপ আরেকটি কবিতা 'উনিশ কি বিশ।' এ-কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে কিছু আরবি ফারসি এবং ইংরেজি শব্দ। যেমন — হয়রান, হেকিম, সওয়াল, নাজেহাল,আল্লার কুদরত, এলেম হাসেল, দুনিয়ায়, শুকরিয়া, ষ্টেডিয়াম, ব্লেডের বাক্স, প্লাষ্টিক ইত্যাদি, যার প্রয়োগগুণে নিয়ামত মল্লিকের ছোট ছেলের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান সহজে হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রূপক কবিতা। এ-কবিতায় প্রশ্নবিদ্ধ ছেলেটির মা যখন বলেন:

বসে থাক পাশে এসে, চেয়ে দেখ ধান আর চাল,--
'কত ধানে কত চাল' এও প্রশ্ন, হায়রে কপাল!
ঢেঁকির খবর নিতে তোরা যাস বিলেতে; এদিকে
মা রয়েছে ঢেঁকিশালে আজীবন, কখনো সেদিকে
ফেরে না তোদের মন।

['উনিশ কি বিশ' : ঐ]

তখন সহজেই মনে পড়ে বিভাষা মন্থনকারী পৃথিবীখ্যাত অমর বাঙালি কবি মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষ নদে পুনর্বার তরী ভেড়াবার ঐতিহাসিক ঘটনাটি। বাঙালি মধু-

সূদন তাঁর প্রতিভাগুণে বিভাষায় জগদ্বিখ্যাত কবি হওয়ার ব্যর্থচেষ্টা করে অনতিবিলম্বে ইওরোপে বসেই লিখেছিলেন 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক সনেটটি। আহসান হাবীবের উল্লিখিত কবিতাংশের পাশাপাশি উপস্থাপিত করা যেতে পারে মধুসূদনের সনেটটির কিয়দংশ :

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে--
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"

বস্তুত এ-কবিতার মধ্য দিয়ে সহস্র সম্ভাবনাময় এবং রত্নগর্ভা বাংলাদেশেরই গুণকীর্তন করেছেন মধুসূদন। অনুরূপ আহসান হাবীবের কবিতায়ও স্বদেশবোধ, স্বদেশপ্রেমের দ্যোতনা পরিস্ফুট হয়েছে রূপকের মাধ্যমে।

পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর বিভিন্ন বিষয় ও চিন্তা এ-কাব্যের কবিতাগুলোকেও স্পর্শ করেছে অনায়াসে। কখনো বৃত্তাবদ্ধ জীবনপটের একরৈখিক জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে এ-কাব্যে, কখনো সমাজমূলগত অবক্ষয়ের অভিশাপ কাব্যের বিষয়ান্তর্ভূত হয়েছে কবিরই কাল ও সমাজ-সচেতনতার কারণে। 'আমার যাওয়া হয়না' কবিতা-অনুধ্যানে উদ্ধার করা যায় বৃত্তাবদ্ধ তথা শহুরে জীবন-যাপনকারী এক কবিকে, যিনি বারবার নস্টালজিয়াক্রান্ত হয়েছেন এবং মুক্তি খুঁজেছেন স্মৃতিময় অতীতে প্রত্যাবর্তন ক'রে। কবির উচ্চারণ এ-রকম:

আমার যেতে ইচ্ছে করে
এক এক সময়ে খুব যেতে ইচ্ছে করে
স্কুলমাঠের সেই অন্ধকারে
সেই আঠারো বছর বয়সের গা ছুঁয়ে
আস্তিনছেঁড়া গেরুয়ারঙ কামিজের ভেতরে ঢুকে
আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে
['আমার যাওয়া হয়না' : ঐ]

অথচ ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছেই থেকে যায়, ফলবতী হয়না মোটেও। এ-কবিতার শেষে কবির স্বীকারোক্তি 'আমার যাওয়া হয় না,' এবং অসহায় অনুযোগ তাঁর, 'আমাকে যেতে দেয় না।' কিন্তু কে যেতে দেয় না তা স্পষ্ট নয়। তবে বুঝে নিতে বেগ পেতে হয়না যে, তাঁর 'সংসার, সমাজ, প্রতিবেশ, পরিপার্শ্ব'ই এই অবরোধ গড়ে তোলে।

এ-কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'দোহাই তোমার।' প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের এ-দীর্ঘ কবিতার প্রধান বিষয় হলো—কবির প্রকৃতিপ্রেম। বিশ্বপ্রকৃতির একটি অংশ যেমন মানুষ, তেমনি বৃক্ষও। সৃষ্টির আদি থেকেই প্রকৃতির ভারসাম্যের মধ্যেই আমাদের সভ্যতা এবং মানব-অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েও মানবের কর্ম হবে প্রকৃতির সংরক্ষণ। আমাদের চিন্তা, সৃষ্টি ও আবিষ্কারই আমাদের সভ্যতা, কিন্তু প্রকৃতিও আমাদের কল্যাণময়ীআদর্শ। ব্যাপক অর্থে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রকৃতিও মানবেরই সহযাত্রী। এ-সত্যের

সন্ধান মেলে কবির উচ্চারণে:

আমরাই নিসর্গ আর নিসর্গই আমরা সব
আমরা নিসর্গে বাঁচি
নিসর্গে নিঃশেষ।
['দোহাই তোমার': ঐ]

আর তাই এ-কবিতায় প্রকৃতির অপার স্নেহবলয়-বিধ্বংসী অকল্যাণের হাতকে ধিক্কার দিয়েছেন কবি। 'নির্মম কুঠার'-হস্ত বৃক্ষ-হন্তারকের উদ্দেশ্যে গ্রীক পুরাণের মিডাসের কাহিনীর উল্লেখ করেছেন কবি। মিডাস হলো প্রতীকী চরিত্র, যার উল্লেখে প্রকৃতই বৃক্ষ-হন্তারকের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে-'মিডাসের কাহিনী ভুলো না।'[১৩]

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রসঙ্গটি শুধুই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। তবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রসঙ্গে 'নির্ভুল সংলাপে' 'সার্চ' এবং 'স্বাধীনতা'— এই তিনটি কবিতা আলোচিত হতে পারে। তিনটি কবিতাই প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে রচিত। দু-একটি উপমা ব্যতীত কবিতাত্রয়ে অলঙ্কারের আধিক্যও নেই খুব একটা। প্রথম কবিতায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি স্মৃতিময়তায় উজ্জ্বল। বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধের জীবন-বিনাশী সেই সকরুণ চিত্র কবি-চৈতন্যকে আলোড়িত করেছে ঠিক এ-ভাবে:

পবিত্র শোকের শবাধার
দেখো ছুঁয়ে আছে বুক
আর দেখো শবাধার ছুঁয়ে
গুলিবিদ্ধ হাজার করোটি আছে নুয়ে।
['নির্ভুল সংলাপে': ঐ]

কিন্তু 'সার্চ' কবিতায় স্বাধীনতার চেতনা সমগ্রতাকে ধারণ করে আছে। এ-কবিতায় কিশোরের রূপকে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এ-ভাবে:

তার
বুকের গভীরে
মহত্তম সেই অস্ত্র যার
দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
ধ্বনি যায় অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভিঃ
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।
[সার্চ : ঐ]

কবিতাটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে —এ-কবিতায় বিদেশী শব্দের যথাযথ প্রয়োগ। কবিতাটির নামকরণই হয়েছে ইংরেজি শব্দ দিয়ে। এমনকি কবিতাটির শুরুর 'হল্ট' শব্দটিও ইংরেজি। অন্যান্য বিদেশী শব্দের মধ্যে 'প্যান্টের পকেটে, বান্ডিল, জরীপ, কুছ নেহি, সাচ্ সাচ্ বাতাও, নেহিত, শার্ট ইত্যাদি উল্লেখ্য। এইসব শব্দ ব্যবহারের সাফল্যে এ-কবিতায় ১৯৭১-এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর

অত্যাচার-হয়রানির আবহটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, বিশেষত উর্দু শব্দগুলোর সফল প্রয়োগে। প্রাসঙ্গিক অপর কবিতাটির শিরোনামা 'স্বাধীনতা'। হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে এ-কবিতায় 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্যোতনা বিশ্বব্যাপ্ত।

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যে অর্থালঙ্কারের আধিক্য কবির সমাজমূলসম্পৃক্ত চৈতন্যের প্রসারতাকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং চিত্রকল্পসৃষ্টির পাশাপাশি রূপক প্রতীকের সাহায্যেই কবি সমাজবাস্তবতা অঙ্কনে অধিকতর সফল হয়েছেন। কবিতার প্রসাধন-বৈভবকে প্রকাশ করতে শব্দালঙ্কারের গুরুত্ব সীমাহীন বলেই স্বীকৃত, যার পরিচয় শব্দের (word) ধ্বনিতে (Sound) মূর্ত্তীভূত। এবং প্রসঙ্গত এও সত্য যে, কবিতার সঙ্গে যেহেতু পাঠ বা আবৃত্তির একটা মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেহেতু প্রসাধন-বৈভবের সাফল্য-ব্যর্থতাও অনেকটা কবিতাপাঠ বা আবৃত্তি-প্রসঙ্গে বিকাশমান। পক্ষান্তরে অর্থালঙ্কারের গোড়ার কথা হলো কবিতার অন্তর্ময় দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা তথা অর্থময়তা। এ-কাব্যে অর্থালঙ্কারের প্রতিই আহসান হাবীবের অধিক আগ্রহ। বস্তুত রূপক প্রতীকের ব্যবহারে আহসান হাবীবের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলো হয়ে উঠেছে বক্তব্য-প্রধান। প্রাসঙ্গিক কবিতা 'ঈদ'-এ উপস্থাপিত হয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। ঈদকে কবি প্রতীকায়িত করেছেন 'বেমক্কা ঘোড়া' বলে। এই বেমক্কা ঘোড়াকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন:

> তাকে আমি বলেছি আমার বন্ধু হও
> থাকো তুমি
> আমার বাগানে তুমি থাকো।
>
> ['ঈদ': *ঐ*]

কিন্তু কবির প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। যে-জৌলুস নিয়ে কবির ভাষায় 'এই অশ্ব মহাশয়' বছরে একবার আসে তাকে কবি 'সম্বৎসরই' প্রত্যাশা করেন। অথচ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেই প্রত্যাশা। প্রাসঙ্গিক আরেকটি কবিতা হচ্ছে— 'মানুষ পশু ইত্যাদি।' এ-কবিতায় 'ফুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এগারোবার, যার প্রতীকী তাৎপর্য চিরকালই পবিত্রতা, কল্যাণময়তা ও মঙ্গল ময়তারসঙ্গেই সম্পৃক্ত। ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রজীবনে মানুষ মঙ্গলকেই প্রত্যাশা করে। তাই:

> মানুষ কি কোনোদিন ফুল ভুলতে পারে? তাই
> বিদীর্ণ মাটিতে বুক পেতে রাখে
> অনায়াসে রক্ত ঢেলে দেয়।
>
> ['বানুষ পশু ইত্যাদি': *ঐ*]

অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়ই কেবল মানুষের ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ জীবন মহিমান্বিত হতে পারে। আহসান হাবীবের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচকতা বস্তুত সামূহিক (Collective) জীবনজিজ্ঞাসার অন্তর্লক্ষণসূত্রেই সুচিহ্নিত।

।।ছয় ।।

পৃথিবীর ক্রোড়েই যে মানব-অস্তিত্বের উৎস এবং বিকাশ, সেই মানব-অস্তিত্ব তার উৎস সন্ধানে চিররত। এমনকি মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের মধ্যে সুন্দর ও কল্যাণের যে-তপস্যা, যে উদ্ভাবনী-স্পৃহা, প্রযুক্তিগত যে-আবিষ্কার ও উন্নয়ন, সে-সবের আলোকসম্পাতেই মানুষ আজ সকল সত্যের বড় সত্য হয়ে উঠেছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের এই বাণী চারশত বছরের পুরানো হলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মানুষকে আজো উজ্জীবিত করে এবং তা সীমাহীন কালগর্ভে মানুষকে তার আত্মানুসন্ধানের পথে চিরকাল পরিচালিত করবে। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থে আহসান হাবীব মানবসভ্যতা এবং মানব-অস্তিত্বের উৎস অনুসন্ধানের প্রসঙ্গেই তাঁর বস্তুগত চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সভ্যতার সূচনালগ্নে পাথরে পাথর ঘষে মানুষ একদা আগুন আবিষ্কার করেছিলো যে-উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে, মানুষের সেই অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির কথা কবি মনে রেখেছিলেন কাব্যের নামকরণ প্রসঙ্গে। মানুষের দুটি 'হাত' এবং 'আদিম পাথর' এখানে প্রতীকী তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল।

মৃত্তিকা সংলগ্ন যে-মনুষ্যসমাজ বাসযোগ্য করে তুলেছে এই পৃথিবীকে, সেই মনুষ্যসমাজের সকল সাধনাই বস্তুত সর্বসংহা মৃত্তিকানুগ। মানুষ যতই অনন্ত-অদৃশ্য শক্তির তুষ্টি সাধনে কালক্ষেপ করুক না কেন, তার মঙ্গল বা কল্যাণ কেবল মৃত্তিকাতেই সম্ভব। সুতরাং জীবনের চলমানতায় সময় যদি থাকে প্রতিকূলে, পথ যদি হয় দুর্গম তথাপি জীবন-অস্তিত্বের ভাবনা কখনোই মাটিকে বাদ দিয়ে নয়। এ-কাব্যের প্রথম কবিতাতেই এই সহজ সত্যটি উচ্চারিত হয়েছে ঠিক এভাবে:

> আমার কিন্তু ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যাওয়াই লাগছে ভালো
> ['সারাদিন আমি': *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*]

জগৎ-সংসারে কোনোকিছুই মানুষের জীবনের অনুকূলে নয়। জীবনধারণ থেকে শুরু ক'রে জীবনসম্পর্কে ধারণা করবার সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষাও বহুলাংশেই সমাজশর্তবন্দী এবং সে-কারণেই তা জীবনের প্রতিকূলে। সুতরাং প্রতিকূল-সর্বস্বতাই যেহেতু প্রকৃতির অমোঘ বিধান সেহেতু তাকে অস্বীকার করা কিংবা তা থেকে বিচ্যুতি-ভাবনা মূলত জীবন-সংগ্রামকেই অস্বীকার করা। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে আহসান হাবীব একদিকে যেমন বিশ্বসভ্যতার জয়গানে মুখর, অন্যদিকে ঠিক তেমনই তিনি দার্শনিকের মতো প্রজ্ঞাবান। এ-কাব্যের কবিতায় দার্শনিক তত্ত্বের কোনো রকম জটিল সমাবেশ ঘটেনি, বরং জগৎ ও জীবন-ভাবনার প্রসঙ্গে সেইসব দার্শনিকতার নান্দনিক উপস্থাপনা সহজবোধ্য হয়েছে। আপন অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই বস্তুবাদী দর্শন কবিতায় হয়ে উঠেছে ভাস্বর।

এ–কাব্যের দ্বিতীয় কবিতার শিরোনামা 'আমি আছি'। আমি আছি— এই উচ্চারণে কবির যে–অস্তিত্বচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তার পাশাপাশি এক ধরনের গতিমানতার আভাসও পরিস্ফুট। মানবজীবনের এই চলমানতার ব্যাপারটি বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের পানে। সুতরাং বর্তমানের কালসীমায় দাঁড়িয়ে কবি তাঁর দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন অতীতের পানে এবং লুপ্ত অতীতের অস্তিত্বের কাছে বিনয়ী হয়েছেন এভাবে:

আমি এই মৃত্যুকে লঙ্ঘন করি বারম্বার
মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে বহমান ইতিহাসে যাই
এবং নিজেকে আমি বারম্বার পার হয়ে ইতিহাসে লগ্ন হই
ব্যাপ্ত হই তোমাতে এবং তোমার স্বজনলোকে।
['আমি আছি': ঐ]

চেতনার অর্ন্তগূঢ় তাৎপর্য বহনে সক্ষম বলেই এ–কব্যের অধিকাংশ কবিতা ব্যঞ্জনাপুষ্ট। একদিকে নাতিদীর্ঘ কবিতার অবয়ব, অপরদিকে ব্যঞ্জনাধর্মিতা— বস্তুত এ–দুয়ের মেলবন্ধনে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যগ্রন্থটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। আঁটসাঁট কাব্যবন্ধনে কবির চেতনা–উৎসারিত বক্তব্য প্রকাশিত। 'আবহমান', 'সময় অসময়', 'সারস', '*ট্রেন*', এইসব কবিতায় মানুষের জন্মমৃত্যু, চিরায়ত–আবেগ অনুভূতি, সুদূরের প্রতি কবির অন্তর্দৃষ্টির প্রক্ষেপণ বা সময়ের প্রবহমানতার প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে অবলীলায়। 'আবহমান' শীর্ষক কবিতার কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র কবিতাটিকে অনন্য করে তুলেছে। এইসব চিত্র যুগ যুগ ধরে মানুষের স্বপ্নে সংগ্রামে পাশাপাশি থাকবে অক্ষয় হয়ে— এই ব্যঞ্জনাই এখানে মুখ্য। কবির চেতনার চিত্রকল্পময় প্রকাশ:

বাড়িতে ছনের চালায় শিশির নামে কাঁঠালপাতার গা বেয়ে
দাশকবির ঘুঘুরা হঠাৎ দু'একবার ডানা ঝাড়ে
খালেক নিকিরির স্বপ্ন তবু পাশ ফিরে শোয় না একবারও
পোহাতী তারার দিকে চোখ রাখে দু'একবার
অলস হাই তোলে আর সমস্ত চেতনা প্রখর হয়ে থাকে
হাতের মুঠোয়।
['আবহমান': ঐ]

আবহমান বাংলার আবহমান চরিত্র খালেক নিকিরির স্বপ্ন ও জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে আহসান হাবীব তিরিশের কাব্য–ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হননি। 'দাশকবির ঘুঘুর' অনুষঙ্গ প্রকাশ করতে গিয়ে আহসান হাবীব শব্দ–নির্বাচন থেকে শুরু করে চরণবিন্যাসেও দাশকবিরই কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন। সময়ের প্রবহমানতার মধ্যেও এভাবেই ব্যক্তির অস্তিত্ব টিঁকে থাকে সমাজে, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে। 'সময়' ধারণাটিই যেহেতু কবির কাছে শাশ্বত বলে বিবেচিত, সেহেতু কবি সময়ের কোনো খণ্ডিত মূল্যমান নির্ণয়ে উৎসাহী নন। এক ধরনের অখণ্ড বোধ বা সমগ্রতাস্পর্শী বোধকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কবিতায়:

অসময় বলে কোনো বৈপরীত্যে আমার বিশ্বাস নেই, তাই
যখন যেমন ইচ্ছে সময়ের সঙ্গে থেকে যাই।
['সময়-অসময়' : ঐ]

কবির জীবনবৃত্ত-সংলগ্ন সময় প্রতিনিয়ত গুরুত্ব বহন ক'রে চলে। সুতরাং মহাকালের কোনো ক্ষণ, কোনো মুহূর্তই পরিত্যাজ্য হতে পারে না। 'সারস' কবিতায় সেই চলমানতার প্রসঙ্গটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত। এ-কবিতায় 'সময়ের ভয়াল প্রতিমাও' নির্মিত হয় ভিন্ন এক দৃষ্টিতে:

বহমানতার কোনো চিহ্ন তোর শরীরে তোলে না
কোনো কম্পন অথবা শব্দ, তুই
ভালোবাসা স্বপ্নসুখ
সুখের সমস্ত ভাবনা
পেছনে রাখিস, সারা
শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা।
['সারস' : ঐ]

মানবজীবনের অনন্তকালব্যাপী যে স্বপ্ন, প্রেম, সুখচিন্তা— এ-সবের চেয়ে সময়ের গতিই যেন কবিকে আকর্ষণ করে বেশি। অনুরূপ 'ট্রেন' কবিতায় বহমানতা বা গতিমানতার প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে 'ট্রেনে'র প্রতীকে।

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যগ্রন্থে কবির সৃজনচৈতন্য সমষ্টির ভাবনাকেই প্রভাবিত করেছে বহুলাংশে। তবে অধিকাংশ কবিতাই প্রতীকী তাৎপর্যে ঋদ্ধ। পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর তুলনায় আহসান হাবীবের এ-কাব্যটি যে-বিবেচনায় 'স্ফটিক-সংহত', তার দৃশ্যমান এবং অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য মূলত কবিতার অবয়বে এবং বক্তব্য-ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেই নিহিত। কবি তাঁর চৈতন্যের মর্মবাণী প্রকাশের প্রক্রিয়াটি ঋদ্ধ করেছেন প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এ-কাব্যে কবিতার অবয়ব দীর্ঘ নয়, বক্তব্য-বিষয়ও নয় মানুষ ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন। সমাজ-অভ্যন্তরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, এখানকার ক্ষত-যন্ত্রণা, বিষাদের নিত্য-অন্ধকার কবিকে আলোড়িত করেছে অনায়াসে। সেই যন্ত্রণার রূপায়ণ দেখি কবিতার নামকরণেও। 'হায় নীল পাখির প্রতিমা'—এখানে পাখির পূর্বে ব্যবহৃত 'নীল' শব্দটি প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। কবিতায় উচ্চারিত:

আজীবন সরল সংসারে তুমি কার
সারা বুক বিদ্ধ করো অমোঘ বর্শায়
সারা দিন
সারা রাত
কার ক্লান্ত শরীরের রক্তস্রোতে
আরো কিছু নষ্ট রক্ত
আরো বিষ
আরো কালো আগুনের তাপ ছড়াও
সংসার পোড়ে
পোড়াও আকাশ পোড়ে সাজানো বাগান।
['হায় নীল পাখির প্রতিমা' : ঐ]

যন্ত্রণা-কাতরতার এ-এক উজ্জ্বল চিত্র। বিনষ্টের চিৎকারে প্রকম্পিত আকাশ বাতাস। কোন্ বিশেষ শক্তি নিয়ে এই 'নীল পাখির প্রতিমা' বিচরণ করছে মানুষের মাঝে, যে নিত্যই নষ্ট করছে সবকিছু? পুড়ছে আকাশ, পুড়ছে সংসার, পুড়ছে সাজানো বাগান! এই স্বপ্নভঙ্গ, হৃদয়ের এই রক্তক্ষরণ এবং বিপন্নতাসূত্রে এ-কবিতায় যথার্থই 'প্রেমের ট্র্যাজেডী' ঘনবদ্ধ হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আহসান হাবীব এ-কাব্যে মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয়েই আপন অস্তিত্ব অনুভব করতে চেয়েছেন বারবার। এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে 'ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে' শীর্ষক কবিতায়। কবিতাটিতে শহুরে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির অস্তিত্ব প্রোথিত ছিলো বরিশালের নদী-বিধৌত পলিমাটিতে। প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন তাঁকে উদাস করেছিলো আশৈশব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে কবি গ্রামজীবনের অস্তিত্বকেই ইতিবাচক দৃষ্টিতে সমর্থন করেছেন এবং কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

স্মৃতি হননের এক উন্মত্ত খেলায় তুমি তোমার বিবরে।
আমি এই খা-খা মাঠ শুকনো নদী ধূসর বনানী
মৃত নীল পাখি নিয়ে একলা পড়ে আছি। তুমি
জলস্রোত শস্যবীজ সবুজতা এইসব নিয়ে
ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে।
['ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে': ঐ]

অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন-পরিবেশ, যার সঙ্গে কবিতার নায়কের সম্পর্ক জন্মগত, আজ সে তার অস্তিত্ব-পরিচয় হারাতে বসেছে। কবির দুঃখবোধ জাগ্রত হওয়ার এইতো কারণ।

'আজন্ম অন্বিষ্ট' শীর্ষক কবিতাটি প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল। এ-কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের শূন্যতা ও একাকিত্বের একটা করুণ সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি আহসান হাবীব Intellectual Person-এর মতো সবকিছুর মধ্যেই এক ধরনের বৈপরীত্য বা প্রতিকূলতা খুঁজে পান। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কবিচিত্তে আশাবাদের সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। আর সেই আশাবাদের অপর নাম বিপ্লব:

সমস্ত পিঞ্জর এখন খোলা থাকবে
এখন সব মানুষের পাখি হওয়ার সময়,
আমি কুয়াশার মধ্যে এক নিরবয়ব পাখির--
উড়াল শুনতে পাই
আমি পাখি দেখতে পাই না
আমি পাখি দেখতে পাইনা
['আজন্ম অন্বিষ্ট': ঐ]

'পাখি' এখানে বিপ্লবের প্রতীক। পিঞ্জরমুক্ত পাখির যে স্বাধীনতাবোধ, সেই বোধের প্রসঙ্গে এখানে বিপ্লব বা মুক্তির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে

কবি কেবল সেই মুক্তি-উল্লাসের পদধ্বনিই শুনতে পান, তা তিনি চোখে দেখেন না। অনুরূপ শ্রেণী-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অপর একটি কবিতা 'আমি তখন।' কবিতার শুরুতেই 'বকুল' আর 'কামিনী'র আকাঙক্ষা কবির মনোজাগতিক সৌন্দর্য-সাধনার প্রসঙ্গেই উপস্থাপিত। এ-কবিতায় 'ব্যাঘ্র' আর 'হরিণ'—এই শব্দ দুটি শোষক আর শোষিতের প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে:

আমি নদী দেখি
শালবন দেখি
ব্যাঘ্রনিনাদ পিঠে তুলে একদল হরিণকে ছুটে যেতে দেখি।
['আমি তখন': ঐ]

কিন্তু তবু সুন্দর আর কল্যাণের জন্যেই কবির নিত্য চলা। অনির্ধারিত গন্তব্যের পানে কবি অবিরাম ছুটতে চান 'কামিনী কামিনী বলে' এবং 'বকুল বকুল' বলে।

ক্রমরা ফুলের ফাঁস' কবিতাটি রূপকে প্রতীকে অনন্য সৃষ্টি। সুসজ্জিত একজন মানুষ সারাদিন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন এক জায়গায়। একটা মরা ফুলের টব তাঁর পথ রোধ ক'রে আছে:

দেখো, সেই সকাল থেকেই লাফাচ্ছি
বাইরে আমাকে যেতেই হবে
বাইরে যাওয়া খুব দরকার
কিন্তু এই টবটা...... ....
(এতক্ষণে দেখলাম, তাঁর পায়ের সামনে
একটা মরা ফুলের টব)
আমি একে পার হতে পারিনা।
['মরা ফুলের ফাঁস':ঐ]

এই 'মরা ফুলের টবটি' নেতিচিত্র-সমন্বিত স্থবিরতার প্রতীক। টবের একটি মরা ফুল— তার জন্যেও একজনের সুগভীর মায়া! আসলে এ-হচ্ছে পুরাতনের প্রতি মানুষের আদিম আকর্ষণ, প্রগতির সম্ভাবনার পথকে যা রুদ্ধ করতে চায়। পুরাতনের প্রতি এই আকর্ষণ বা এই ফাঁস নিজের হাতেই ছিঁড়তে হয়:

বরং নিজের হাতেই সরিয়ে নিন
ফাঁসটা নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলুন।
['মরা ফুলের ফাঁস':ঐ]

জীর্ণ পুরাতনকে অতিক্রম করতে চাইলে চেতনান্তর্গত সেই প্রতিবন্ধকতা নিজেকেই অপসারণ করতে হবে। বৃত্ত ভাঙতে হবে নিজেকেই—কবিতার অন্তিমে সেই আহবান।

কেবল প্রগতির পথেই পৃথিবীর প্রকৃত সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হতে পারে। বস্তুধর্মকে প্রকৃত ধর্ম বলে স্বীকার না করলে প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকনে শুধু বিস্মিতই হতে হয়, তাতে আনন্দ পাওয়া যায় না। এমনকি মানুষের প্রয়োজনচেতনাও বড় হয়ে দেখা দেয়না। বস্তুধর্মে বিশ্বাস ছিলো আহসান হাবীবের। সারাজীবন কবি বস্তুময় পৃথিবীর সৌন্দর্যেই কেবল মুগ্ধ হয়েছেন। আদিম উন্মত্ততায় পৃথিবীর সৌন্দর্য

বিনাশে যারা উদ্যত হতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আকৃতি ধ্বনিত হয়েছে 'পাখিদের বলি' শীর্ষক কবিতায়। এ-কবিতায় 'কৃষ্ণভল্লুক' শব্দটি বিনাশী শক্তির প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত:

সমুদ্র-পিঞ্জর ভেঙে
যায় কৃষ্ণ ভল্লুকের
উন্মত্ত মিছিল
ছুটে যায়
ক্রোধোন্মত্ত দানবের আদিম নিনাদ যায়
পৃথিবীর পঞ্জর এবং অস্থি যায় দুমড়ে যায়
['পাখিদের বলি': *ঐ*]

এই বিনাশী দানবশক্তির হাত থেকে মাটি আর মানুষকে রক্ষা করবার অন্তর্গত প্রবল ইচ্ছার কথাও ব্যক্ত হয়েছে এ-কবিতায়:

সেইসব পাখিদের এ তাণ্ডবে ছেড়ে দিয়ে
ইচ্ছে হয় বলি:
এইসব প্রচণ্ডতা এই অন্ধ ক্ষিপ্ততা
এবং এই প্রবল দাপট
অটল রক্তিম ঠোঁটে তুলে নাও
সুনীল পাখায় ঢাকো মথিত মৃত্তিকা তার দীর্ণ বুক
তাকে সুস্থ শান্ত হতে দাও।
[*ঐ*:*ঐ*]

'পাখি' এখানে সুন্দর আর কল্যাণকামী মানুষের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। যুদ্ধ, দাঙ্গা, অপ্রীতি এ-সবের বিরুদ্ধে 'সেইসব পাখিদের' জেগে উঠতে আহবান করেছেন কবি, যাদের 'রক্তিম ঠোঁটের' স্পর্শে সকল উন্মত্ততার অবসান হবে, আর 'সুনীল পাখায়' মাতৃস্নেহের মতো পরম আবেগ সোহাগে ঢাকবে মৃত্তিকার সকল ক্ষত।

জীবনব্যাপী পৃথিবীর যে-বিচিত্র রূপ কবিচৈতন্যের মর্মমূলগত হয়েছে, তারই বিচিত্র-বর্ণিল চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে। বস্তুঅভিজ্ঞতা আর হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যই কবির শিল্পপ্রয়াসকে অভিব্যঞ্জনা দান করেছে। পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতে একাকিত্ব, ইতি-নেতি, নস্টালজিয়া প্রভৃতি বিষয় বিশেষ দ্যোতনায় সমুপস্থিত। কিন্তু *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে সুগভীর অনুভূতিসঞ্জাত কবির আপন অস্তিত্বের জয়গানই মুখ্য হয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রসঙ্গে। সে-জন্যেই বারবার বৃক্ষ, নদী, পাখি, আকাশ, নক্ষত্র— এইসব অনুষঙ্গ ভিড় করেছে কবির মনশ্চক্ষুর দ্বারপ্রান্তে। তবে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমেই কবি তাঁর সৃজনচৈতন্যের স্বাক্ষর রাখতে অধিক আগ্রহী। এ-কাব্যের অন্তিম পর্যায়ে 'প্রেক্ষাপট' শীর্ষক কবিতায় 'লাল গোলাপ' হয়ে উঠেছে বিপ্লব বা অঙ্গীকারের প্রতীক। এ-কবিতায় 'স্পর্ধিত তারুণ্য' শত প্রতিকূলতার মধ্যেও অনুকূল অবস্থার স্রষ্টা। 'নীল নক্সা' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কবি চিহ্নিত করেছেন এই বলে— 'পৃথিবীর অর্ধেক ভূখণ্ড এখন তার কবলে।' 'টান' শীর্ষক কবিতায় বিবৃত হয়েছে সমাজ-

অভ্যন্তরের বন্ধ্যা অবস্থার চিত্র। এ-অবস্থা থেকে মুক্তি প্রয়োজন। আর এই মুক্তি কেবল অর্জুনেরাই দিতে পারে। 'অর্জুন' এখানে প্রতীকী চরিত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিজয়ী বীর অর্জুনের বীরত্ব আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

আত্মহনন নয়, আত্মানুসন্ধান কিংবা আত্ম-আবিষ্কারই হলো একজন সচেতন মানুষের সারাজীবনের কর্ম: এই বোধদীপ্ত চেতনার নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে *'দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের সর্বশেষ কবিতায়। কবির মনোলৌকিক মানচিত্রে অনায়াসে জেগে উঠেছে বৃক্ষ, বাঁশবাগান; বৃহৎ অধিকার নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নদী; হাস্যোজ্জ্বল বিভায় প্রস্ফুটিত 'আসমানের তারা'; মাছরাঙাও কবিকে চেনে; কদম আলী-জমিলার মা রক্তের না হলেও তারা আত্মার আত্মীয়। এই আত্মীয়তার বন্ধন অদৃশ্য, কিন্তু তার স্থায়িত্ব সহস্র বছরের। তাই কবি বলেন:

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
    তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
    সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির, সাক্ষী জোৎস্নার চাদরে ঢাকা
    নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
    তার ক্লান্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
        সে আমাকে চেনে।
    ['আমি কোনো আগন্তুক নই': *ঐ*]

বস্তুত এ-কবিতাটি কবির আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক। একজন সংবেদনশীল কবির পরিচয় এর চেয়ে আর কি হতে পারে! আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের ব্যগ্রতায় আকুল কবির 'খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা এ-ভাবে অন্যতম কবি প্রেরণায় পরিণত। এই যন্ত্রণার বৃন্তমূলে মুকুলিত কবিতা তখনই পূর্ণতায় বিকশিত হয়ে ওঠে, যখন তা' একান্তই ব্যক্তিচিত্তের নিভৃত বেদনাবিলাসে কুঁকড়ে না গিয়ে, ব্যক্তি, সমষ্টি ও প্রকৃতি, এই তিনের সমগ্রতার মধ্যে দল-পাঁপড়ি মেলতে চেষ্টা করে।'[১৪] আত্মবিহ্বল কবি বলেছেন:

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
    লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
        [ঐ: *ঐ*]

এ-বর্ণনা পাঠকের চেতনাকে সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তোলে। বস্তুত এখানে এদেশের মাটি-বায়ু-জলের সঙ্গে কবির অস্তিত্বের সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে। আত্ম-আবিষ্কারের এই শাশ্বত রূপ বর্ণে গন্ধে সমুজ্জ্বল।

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আবার মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ মিলেছে অন্ত্যমিলসর্বস্ব মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দেরও। এ-কাব্যটির শুরু স্বরবৃত্ত ছন্দের একটি কবিতা দিয়ে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি কবিতায় কবি অন্ত্যমিল বজায় রেখে চমৎকারভাবে চরণ ভেঙে দিয়েছেন। যেমন:

ভালোবেসে দু'হাত বাড়ালে
সময় দেখে না তাকে সন্দেহের চোখে, তার
বুক জুড়ে মেলে দেয় ঋদ্ধ অবয়ব,
থাকে। আর ইচ্ছেমত সময়ের আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব
['সময়-অসময়': *ঐ*]

অথবা,

আমি তো শান্তই আছি সুস্থ আছি
কেবল প্রস্তরীভূত হতে রাজি নই,
দর্পণে দাঁড়িয়ে রোজ প্রস্তুতির দুর্ভার কাকে
চালাতে সম্মত নই।
[ঐ: *ঐ*]

বরাবরই কবিতার শব্দ-নির্বাচনের সময় কবির মাঝে এক ধরনের সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। সচেতন-শব্দনির্বাচনের কারণে এ-কাব্যের কবিতাগুলোর প্রায় সবই সংহতরূপ লাভ করেছে। ভাষাভঙ্গিতে কখনো কখনো প্রভাব পড়েছে সুধীন দত্তীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ:

ক্রমশঃ বিশাল নদী ক্রমান্বয়ে সমুদ্র উত্তাল। তার
আবাল্য লালিত ঘৃণা রৌদ্রস্নাত জিঘাংসায় জ্বলে,
সে যায় দক্ষিণে, যায় উত্তরের নিত্যক্রোধ প্রবল বিক্রম।
['এইভাবে উত্তরে দক্ষিণে': *ঐ*]

এ-স্তবকের ধ্বনিময়তা সহজেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যধ্বনি জাগিয়ে তোলে পাঠকচিত্তে। কিংবা উল্লেখ করা যেতে পারে এই কবিতাংশটুকু:

শুধু মত্ত হা হা স্বর আছে
আছে অন্ধ প্রচণ্ডতা প্রবল মত্ততা আছে
আছে ব্যাপ্ত চরাচরে আদিগন্ত তুমুল বিক্রম।
['পাখিদের বলি': *ঐ*]

বস্তুত আহসান হাবীব তিরিশের কাব্যবৃত্ত অতিক্রম করতে পারেন নি। অবচেতনার ছিদ্রপথে হঠাৎ করেই তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে সুধীনদত্তীয় কাব্যধ্বনির ন্যায় এক ধরনের ধ্বনিময়তা। আবার কখনো কখনো তাঁর কবিতায় পরিদৃষ্ট হয় জীবনানন্দ দাশের কাব্যচিত্রের মতো এক ধরনের চিত্রময়তা। কিন্তু তবু তিরিশের কাব্য-ঐতিহ্যকে ধারণ করেও আহসান হাবীবের কাব্যসত্তার যথার্থই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

।। সাত ।

সংবেদনার কারুময় প্রকাশগুণে এবং মনোলৌকিক সুগভীর বোধ ও জিজ্ঞাসাসঞ্জাত সৃষ্টি-ঐশ্বর্যে আহসান হাবীবের কাব্যসম্ভার নিঃসন্দেহে বিভামণ্ডিত। তাঁর কাব্যসম্ভারের সর্বশেষ সংযোজনা *বিদীর্ণ দর্পণে* মুখ(১৯৮৫)। মৃত্যুপূর্বকালে প্রকাশিত এ-কাব্যের কবিতায় বিনাশী মৃত্যুর সুর অনুরণিত হতে শোনা যায়। জীবৎকালে যা-কিছু কবির সৃষ্টিপ্রেরণারূপে কাজ করেছে এবং যা-কিছু ছিলো বিচিত্র বর্ণিল, মৃত্যুকালে সে-সবই যেন হয়ে উঠলো পাংশুবর্ণ অনিবার্যভাবে। কবি যেন বুঝতে পেরেছিলেন আর তাঁর সময় নেই, যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে সব। যে-প্রবহমান সময়ের অনুষঙ্গে কবির লেখনী সচল ছিলো, সময়ের সেই প্রবহমানতার মধ্যেই তাঁর বিনাশের সুর করুণভাবে বাজতে থাকলো— এ-যেন কবি বুঝতে পেরেছিলেন। সে-জন্যেই তাঁর হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং জীবনকর্মের নির্ঘন্ট প্রদানে তিনি ছিলেন শশব্যস্ত।*বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের শুরুতেই কবির জীবনেতিহাসের বিচিত্ররৈখিক চিত্র উপস্থাপতি হয়েছে 'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' শীর্ষক রচনাংশে। এ-অংশটিকে কাব্যের ভূমিকাংশ বলা যেতে পারে, যার মধ্যে কাব্যগুণও বর্তমান।

'পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ' রচনাংশে পাইব্বকবির পিতা একদা তথা-কথিত 'মুরুব্বীর পরামর্শে' কবিকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন 'চরিত্র শোধনের সদুদ্দেশ্যে।' কবির ভাষায় 'কিন্তু চরিত্র শুদ্ধ হলো অন্য পথে।' আমরা জানি সে-পথ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গিকারের প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার পথ। কবির জীবনে সাহিত্যচর্চার শুরু হয়েছিলো ঠিক এ-ভাবে:

> '— বাড়ীতে মামাবাড়ীতে পুরানা আমলের গদ্যপদ্য
> নানাধরনের বই, মধ্য-যুগীয় পুঁথি, ভারতচন্দ্র, নজিবর রহমান
> আর মীর মশাররফ আর সেই সঙ্গে শেখ হাবিবর রহমানের
> অনুবাদ হাফিজ এই সব পড়তে পড়তে এক সময় বুঝি মনে হলো,
> আমিও কি পারিনা।'[১৫]

কবির এই ক্ষুদ্র আত্মজিজ্ঞাসাই একদা সাহিত্যের মহীরুহের জন্ম দিয়েছিলো। পরীক্ষামূলক 'দু'চার লাইন লিখতে লিখতে' এক সময় লেখালেখির অভ্যাস তাঁর মজ্জাগত হয়ে উঠলো সৃষ্টির প্রবল প্রেরণায়। চেতনায় প্রভাব ফেলতে থাকলো প্রকৃতি:

> ছোট মহকুমা শহর পিরোজপুর।..............
> ....
> কিন্তু ছোট্ট একটুখানি শহরই আমাকে
> ডোবালো। নীল রঙ কবে কেমন করে আমার মর্মমূলে
> গেঁথে
> গিয়েছিলো। গ্রামের বোর্ড স্কুলের বাগানে অনেক নীল
> রঙের ফুল ফুটে থাকতো।
> ['পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ': *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*]

প্রকৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সময় এভাবেই কবিকে এগিয়ে নিয়ে এলো সাহিত্য–সাধনার সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী। নীল রঙের সেই ক্ষুদ্র একটি ফুল থেকে শুরু করে 'শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু'— জীবনের পরন্ত বেলায় দাঁড়িয়েও কবির এ–উচ্চারণ বিস্ময়কর। মৃত্যুঘন্টাধ্বনি যখন বাজছে তখনও তিনি শ্রেণীবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য এ–সব নিয়ে ভাবছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে। বস্তুত কবি বা শিল্পীমাত্রেই সমাজের একটি বিশেষ অংশ, মৃত্যু পর্যন্ত যাঁদের চোখ–কান উন্মুক্ত থাকে পরম সত্যকে দেখবার জন্যে জানবার জন্যে। সত্যোপলব্ধি এবং তার প্রকাশই কবির বা শিল্পীর পরম আরাধ্য।

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ কাব্যের প্রথম কবিতা 'বসবাস নিবাস।' এ–কবিতায় 'পাখি' 'পথের বাতাস' 'নদী'—এ–শব্দগুলো প্রতীকী তাৎপর্যবহ।'কোথায় নিবাস?'— প্রশ্নবাণ একাধিক বার নিক্ষেপ করছেন কবি এ–কবিতায়। অথচ নিরুত্তর সব, অথচ সব চলেছে নিরুদ্দেশের পথে অবিরাম:

পাখির উড়াল দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?
পথের বাতাস উড়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?
কি নিঃসঙ্গ নদী বয়ে যায় একা নদী
কোথায় যে যায়
কতদিন তাকে প্রশ্ন করেছি নিবাস কোথায়
নিবাস কোথায়?
['বসবাস নিবাস': *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*]

গতিমানতার প্রতীক পাখি, পথ, নদী—এ–সবের কাছে যখন উত্তর পাওয়া গেলোনা একমাত্র প্রশ্নের, তখন:

হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন
কোথায় নিবাস?
[ঐ : ঐ]

দর্পণে বিম্বিত আত্মপ্রতিকৃতির কাছে এ–জিজ্ঞাসার পর আর কোনো—উত্তরের প্রতীক্ষা নেই এ–কবিতায়। হয়তো সীমাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনো জগতের ইঙ্গিত কবি পেয়ে গেছেন। অন্ধকার সে–জগতের আরেক নাম মৃত্যু, এবং সে–মৃত্যুর করাল গ্রাস যেহেতু দুর্নিবার, সেহেতু আর কোনো কথা নয়, শুধু নীরবতা।

অচরিতার্থতার বেদনাভার বহনে সক্ষম কোনো মহৎ প্রতিভাই কেবল জন্ম দিতে পারে সার্থক কোনোকিছুর। 'রূপকথা' শীর্ষক কবিতায় সেই অচরিতার্থতার বেদনার প্রকাশ ঘটেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। এ–কবিতায় কিছু স্বপ্ন বহন ক'রে অনন্তের পথে চলেছে একটি 'নীল রেল গাড়ি।' রেলগাড়িটি তার চলৎশক্তি হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবু থামতে পারে না কোথাও:

একটি ছোট নীল রেলগাড়ি
ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয় ক্লান্ত হতে হতে
যেখানেই থামতে চায় আলো নিভে যায়।
চারদিকেই হায় হায় রব স্টেশনের কর্তা বলে, নেই
স্বপ্নটপ্ন নামাবার যোগ্য কোনো মুটে নেই আমার এখানে
নেই স্বপ্ন রাখবার মতো যোগ্য কক্ষ একটিও।
['রূপকথা': ঐ]

স্মরণ রাখা দরকার, যন্ত্রণা বা বেদনার রঙ সবসময়ই নীল। এবং এ-কবিতার 'নীল রেলগাড়ি' স্বয়ং কবিই। বেদনাভারাতুর দীর্ঘ জীবনে কবি শুধু স্বপ্ন লালনই করেছেন, স্বপ্নের কোনো সুদৃশ্য বাগান রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রেণী-অবস্থান বিচার ক'রে বললে এ-কথা অত্যুক্তি হয় না যে, চিরকালই মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে এবং সেই স্বপ্নভঙ্গের সূত্রেই একজনের স্রষ্টামনন সৃষ্টিপ্রেরণায় প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ হতে থাকে।

মৃত্যুর ভীষণমূর্তি সামনে দণ্ডায়মান, তবু সামাজিক অঙ্গীকারের কথা কবি বিস্মৃত হননি। অচরিতার্থতার বেদনা হৃদয়ে যতই বাজুক, আশাবাদের সুর হৃদয়ে তার দ্বিগুণ বাজে। তাই কবির অঙ্গীকার:

আমি তার বিরান শস্যের মাঠে
অলৌকিক জোয়ারের জল
এনে দেবো, আমি
তাকে দেবো সমৃদ্ধ মরাই আর
বসনে সৌরভ দেবো
জানালায় সুবাতাস দেবো।
আমি প্রচণ্ড খরায় তার বুক থেকে
তৃষ্ণা তুলে নেবো।
['এই ব্যাপ্ত জনপদ, আমি তাকে': ঐ]

আশাবাদের এই উচ্চারণ পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতেও স্পষ্ট হয়ে আছে। এ-কাব্যেও যেন কল্যাণের জন্যেই কবির আর্তি। সামাজিক কল্যাণ কেবল সামাজিক রূপান্তরেই সম্ভব। 'রূপান্তর' শীর্ষক কবিতায় তাই এক ধরনের রূপান্তর বা পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এ-কবিতার নায়ক এক সময়:

একতারা বাজাতো রাতে
মধ্যরাতে ডাহুকের ডাক——
সারারাত শিশিরের শব্দের সঙ্গীতে
দুলে দুলে ভেসে যেতো স্বপ্নের ভেলায়।
['রূপান্তর': ঐ]

অথচ মা তার 'নিভন্ত উনুন রেখে একপাশে' ক্লান্তিতে বসে থাকতো। এখন ওই নায়কের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন পরিলিক্ষিত হয়:

এখন প্রত্যহ দেখি গ্রাম প্রান্তে সে এসে দাঁড়ায়
যেন সিংহ দরোজায় অটল প্রহরী, যেন
অবিচল একাগ্রতা সারাদেহে ইস্পাত কঠিন
[ঐ : ঐ]

নায়কের এই পরিবর্তনের রূপকে সামাজিক পরিবর্তন তথা সামাজিক অগ্রগতির কথা ব্যক্ত হয়েছে এ-কবিতায়। সবকিছু বদলায়— বস্তুবাদী দর্শনের এ-কথাটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত এখানে। পুরাতনের জায়গায় নতুনের উপস্থিতির প্রত্যাশা কবির সৃজন-চৈতন্যকে আলোকিত করেছে পুনর্বার :

সব পুরাতন
এই ভাবে উপড়ে যায় এইভাবে উড়ে যায়
বাতাসে বাতাসে।
....
যে আদিম সূর্যোদয় জ্বলে ছাই হয়ে গেছে
পুনরাবর্তন নয়
আরো একটি আদিম সকাল
নতুন বর্ণাঢ্য আর ফলবান
সমৃদ্ধ সকাল, যার
দু'চোখে আমার শুষ্ক মাঠে মাঠে নবতর ফসলের আলো
['আর একটি আদিম': ঐ]

নতুন-পুরাতন, হতাশা-ব্যর্থতা, সমাজ-সময় এ-সব বিষয়ই পূর্বাপর আহ্সান হাবীবকে প্রণোদিত করেছে। তিনি নিজেও কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে :

'বন্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহাযুদ্ধের দায় এই সবই সমগ্র রাত্রিশেষের উপজীব্য। উত্তরতিরিশ কবিতার সমাজ সচেতন অধ্যায়ে নিজের সংলগ্নতা আমি এভাবেই এই সময়ে আবিষ্কার করি।

তারপর ক্রমান্বয়ে ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দু'হাতে দুই আদিম পাথর এবং প্রেমের কবিতা। শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু।'[১৬]

সুতরাং এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যে সেইসব বিষয়কে কবি স্থান দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতেও বিস্তৃতভাবে ছিলো।

'প্রিয়তমাসু' কবিতায় আহসান হাবীব অন্ত্যমিলের সাহায্যে মানুষের জীবনের একটি মৌলিক বৃত্তির বিষয় উপস্থাপন করেছেন পরম অনুভববেদ্যতায়। ক্ষুধার কাছে মানুষের পরাভব কত দ্রুত সংঘটিত হতে পারে এবং বিনষ্টের গহবরে একজনের কেমন ক'রে অনুপ্রবেশ ঘটে, এ-কবিতা সে-চিত্রই ধারণ ক'রে আছে। রোম্যান্টিকতার বিপরীতে এ-কবিতায় মানুষের প্রয়োজনচেতনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে:

মনে সাধ ছিলো সঙ্গিনী হবে সখের মেলায়
তুমি মেতে গেলে কালো অঞ্চলে
ভাত কুড়োবার মরণ খেলায়
['প্রিয়তমাসু': ঐ]

হৃদয়বৃত্তির এই ট্র্যাজিক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিলো এ-কবিতায়। উত্তর তিরিশের অন্যতম প্রগতিশীল সমাজবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একদা ক্ষুধার তীব্রতায় পূর্ণিমার

চাঁদকে উপমিত করেছিলেন ঝলসানো রুটির সঙ্গে। ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রসঙ্গে এ-কবিতার যে-পরিণতি আহসান হাবীব নির্মাণ করেছেন সেখানে সমষ্টির চেতনাও সমুপস্থিত। কবিতায় বিচ্ছিন্ন কোনো ভাব পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়ে জন্ম দিতে পারে বৃহৎ ভাবের, সমষ্টির চেতনাকে যা উচ্চে তুলেধরে। 'না বাউল, সংসারীও নয়' শীর্ষক কবিতায় যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা:

না বাউল, সংসারীও নয়।
কতিপয় মানুষের বাস এইখানে
খুঁটিহীন চালহীন আবাসে নিবাস।
তারা না বাউল সংসারীও নয়।
['না বাউল, সংসারীও নয়': ঐ]

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক— তবে তারা কি? অন্য কিছু নয়, সমাজের ছিন্নমূল মানুষ। যারা কিছুই বলেনা, 'অথচ ক্ষুধার কথা বলে তৃষ্ণার কথাও।' ক্ষুধা তো অলৌকিক কোনো কিছু নয়, মানুষই ক্ষুধার স্রষ্টা। প্রসঙ্গত কবির উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে:

আজ আমি বলি, অহংকার করেই বলছি, পরাক্রান্ত ক্ষুধাকে
আমি কবিতার ওপরে হুকুম চালাতে দিইনি। ফিরে যাইনি।
পিরোজপুর বা শঙ্করপাশায়, আপন বিবরে। তবে এই সময়ে
ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারি, ক্ষুধাই সেই হননকারী শত্রু যে
মানবজীবন থেকে কবিতাকামনা হরণ করে, তাকে কবিতাহীন নরকে
অনবরত আছড়াতে থাকে। আরো বুঝতে পারি, অনির্বার
ক্ষুধা মানুষই তৈরি করে মানুষের মধ্যে। এবং এই সময় থেকেই
কবিতা আমার আক্রান্ত হতে থাকে ক্ষুধার হাতে, তার অর্থ
কবিতা তার চরিত্র বদলাতে থাকে। ক্ষুধার সেই রাজ্যে কবিতা
কিছু বলবার দায়িত্ব নিতে থাকে।[১৭]

মহান দায়িত্ববোধের কারণেই আহসান হাবীবের এ-কবিতায় উপস্থাপিত হলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবীর' দ্বন্দ্ব, এবং কবিতা পক্ষ নিলো কর্ষণজীবীর।

কবিতার পক্ষপাতিত্ব আরো তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে 'স্বজনদের কথা' শীর্ষক কবিতায়। এ-কবিতায় পৃথিবীর আদিম সভ্যতার জয়গানের প্রসঙ্গে কর্ষণজীবীরই পক্ষ নিয়েছেন কবি:

চকচকে মসৃণ জাল এক হাতে
অন্য হাতে বৈঠা কার
ভাসমান অথৈ নদীতে?
একঝাঁক রূপালি শস্যের খোঁজে কার
দিন যায় রাত যায়?
কে এমন আত্মমগ্ন সন্তের মতন যায়
যায় ভেসে যায়, যায়
আমার আপন জন,
একান্ত স্বজন যায়
সে আমার ভাই।
['স্বজনদের কথা': ঐ]

ইতিবাচক জীবন-অভীপ্সায় মানুষ যদি তার অস্তিত্বের উৎস সন্ধানে ছোটে—তবে তাকে এ-জায়গায় ফিরে আসতেই হয়। আহসান হাবীবের সৃজন-চৈতন্য কৃষিজীবী রক্তস্রোতকে অস্বীকার করতে পারেনি। পৃথিবীর শত সঙ্কটেও :

আমাদের উৎসলোক আলোকিত ক'রে
এরা আছে
এরাই ধারণ করে আমদের জীবন যাপন।
[ঐ: ঐ]

বিদীর্ণ দর্পণে মুখ কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'যাবো না।' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে এ-কবিতায়। মাটির প্রতি পরম আকর্ষণ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তিরই একটি। পৃথিবীর খেলা অবসানে কবির ডাকে এসেছে এক অন্ধকার জগতের। কিন্তু স্মৃতিহননের পথে চলতে চাননা কবি। শুধু কবিই নন, একজন পরম ধার্মিকও কখনই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চায়না। সে কেবল পৃথিবীর বুকেই বেঁচে থাকতে চায়। কারণ পৃথিবীই সত্য, পৃথিবীই তার একমাত্র ঠিকানা। বিপুল বিষণ্ণতার সুরে কবি বলেছেন :

পাখিরা নদী পার হতো
নদীর জলে কালো কালো ছবি এঁকে যেতো
ছবিগুলো কখনো কখনো
ভেঙে ভেঙে নদীর জলে নাচতো
আমি বসে বসে সেই ভাঙচুর দেখতাম
এখনো দেখি
কিন্তু সে সব ছবি আর দেখবো না।
['যাবো ন': ঐ]

চিত্রকল্পময় এ-উচ্চারণে কবির সুগভীর বেদনার কথা ধ্বনিত হয়েছে। কারণ সব থাকবে পৃথিবীতে, কেবল কবিই থাকবেন না—এ-মূহূর্তে এ-বেদনার ভার বহন করা কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। জীবনের দীর্ঘ প্রহরে কবি পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেই থেকেছেন পূর্বাপর। বস্তুধর্মকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন অধিক।

তথ্যনির্দেশ

১. আজীজুল হক: *অস্তিত্বচেতনা ও আমদের কবিতা:* বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশন্ব ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫; পৃ. ৭
২. হাসান হাফিজুর রহমান : আধুনিক কবি ও কবিতা; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ— ১৩৭২; দ্বিতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩; পৃ. ২৫৫
৩. সৈয়দ আকরম হোসেন: *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য* প্রসঙ্গ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫; পৃ. ৩৭
৪. তুষার দাশ: নিঃশব্দ বজ্র: আহসান হাবীবের কবিতা; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫; পৃ. ১২
৫. হাসান হাফিজুর রহমান : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৪৫

৬. তুষার দাশ: পূর্বোক্ত; পৃ. ১৫
৭. 'আহসান হাবীবের সমাজ চেতনা যে অনেক সময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ ধরে তা আমরা 'রাত্রিশেষ'-এ অবলোকন করেছি, ছায়াহরিণ'-এ সারা দুপুর'- এ এই চেতনা আরও প্রখর। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের 'হক নাম ভরসা' এবং 'ছহি জঙ্গনামা' কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য।'— রফিকুল ইসলাম: *আধুনিক কবিতা;* প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ ; পৃ. ২৬
৮. 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে' কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো কোনা কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' -*জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* নাভানা, কলিকাতা; প্রথম সংস্করণ— মে, ১৯৫৪; চতুর্থ সংস্করণ— ডিসেম্বর, ১৯৬৩; ভূমিকাংশ।
৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়;* দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা; প্রথম সংস্করণ— আগস্ট, ১৯৫৮ তৃতীয় সংস্করণ— মে, ১৯৮৪; পৃ. ১৬৩
১০. আহসান হাবীব: *আশায় বসতি;* আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা ; প্রকাশ— ১৯৭৫ ; পৃ. ৫২
১১. তুষার দাশ : পূর্বোক্ত ; পৃ. ৬২
১২. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৪
১৩. আহসান হাবীব: *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো;* সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা; প্রকাশ-- ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ; পৃ. ৩১
১৪. আজীজুল হক : পূর্বোক্ত ; পৃ.৪১
১৫. আহসান হাবীব : *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ;* বইঘর, চট্টগ্রাম ; প্রকাশ— ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫; পৃ. ১০
১৬. পূর্বোক্ত ; পৃ. ১৩
১৭. পূর্বোক্ত ; পৃ. ১৩